অনুষ্ঠানসূচি

সূচনা বক্তব্য

✓ লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির
(নির্বাহী সভাপতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি)

বক্তা

✓ এডভোকেট শামসুল হক টুকু এমপি
(মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার)

✓ অধ্যাপক অজয় রায়
(সভাপতি, হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটিজ)

✓ এডভোকেট মাহবুবে আলম
(এটর্নি জেনারেল, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ)

✓ অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন
(সহ সভাপতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি)

✓ অধ্যাপক মিজানুর রহমান
(সভাপতি, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন)

✓ এডভোকেট রানা দাস গুপ্ত
(সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ)

✓ শহীদজায়া শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী
(সহ সভাপতি, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি)

প্রধান অতিথি

✓ ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ
(মাননীয় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী)

সভাপতি

✓ অধ্যাপক কবীর চৌধুরী
(সভাপতি, উপদেষ্টা পরিষদ, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি)

বিএনপি-জামাতের নির্যাতন এবং অপরাধ থেকে দায়মুক্তির সংস্কৃতি

শাহরিয়ার কবির ● মুনতাসীর মামুন

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনের পর ২০ অক্টোবর ২০০১ নির্মূল কমিটি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নির্যাতনের জবানবন্দী প্রদান করে নির্যাতিত পূর্ণিমা। মঞ্চে নির্যাতিত পরিবারের সঙ্গে (ডান থেকে) ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, পূর্ণিমার মা বাসনা রাণী শীল, শাহরিয়ার কবির, পূর্ণিমা রাণী শীল, শহীদজায়া শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী, স্থপতি রবিউল হুসাইন ও কাজী মুকুলকে দেখা যাচ্ছে

১৬ মে ২০০৩ তারিখে শাহরিয়ার কবিরের নেতৃত্বে নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় ও চট্টগ্রাম জেলার নেতৃবৃন্দ বাঁশখালী গিয়েছিলেন যেখানে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল আরতি রানী, তার মা ও মেয়েকে। তাঁরা প্রতিবেশী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে চট্টগ্রামে এসে সাংবাদিক সম্মেলন করেন

২০ জুলাই ২০০৩, বাগেরহাট মোরেলগঞ্জের ধর্ষিতা আরতী রানী নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরের কাছে নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন

২১ জুলাই ২০০৩, সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার এই সংখ্যালঘু নারী বিএনপি জামাত জোট সন্ত্রাসীদের নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি হয়েছেন। হাতজোড় করে তার আকুল আর্তি ঃ 'দয়া করে আমাদের এদেশেই থাকতে দাও। আমরা এ মাটিতেই বাঁচতে চাই'

জোট সরকারের নির্যাতন এবং অপরাধ থেকে দায়মুক্তির সংস্কৃতি

শাহরিয়ার কবির ◈ মুনতাসীর মামুন

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

পুস্তিকা/ ৯৪
প্রথম প্রকাশ
১২ মে ২০১১

প্রকাশক
কাজী মুকুল
সাধারণ সম্পাদক
একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি
গ-১৬ মহাখালী, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা

Publication/ 94

Articles on 'Repression of four party allience govt. & culture of impunity' by Shahriar Kabir and Muntassir Mamoon

Published by
Kazi Mukul, General Secretary
Forum for Secular Bangladesh and Trial of War Criminals of 1971
Ga-16 Mohakhali, Dhaka-1212, Bangladesh
Phone : 0088-02-8828703, Fax : 0088-02-8822985
e-mail : <danaprnt@bdcom.com>
web site : <www.secularvoiceofbangladesh.org>

First Published : 12 May 2011

Price : Tk. 40.00 (Bangladesh) US $ 5.00 (outside Bangladesh)

সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য

১৯৯২ এর জানুয়ারিতে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'। প্রায় দুই দশক যাবৎ আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পাশাপাশি, তাদের সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সংবিধান পুনঃপ্রবর্তনের জন্য আন্দোলন করছি। ২০০১ সালে খালেদা-নিজামীদের বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, মুক্তচিন্তার বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী এবং সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর যে নজীরবিহীন নির্যাতন, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করেছিল তার প্রত্যক্ষ শিকার ছিল 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'।

খালেদা-নিজামীদের যুদ্ধাপরাধী, মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তি অধ্যুষিত জোট সরকার নির্মূল কমিটির শীর্ষনেতা লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির ও অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শতাধিক নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক মিথ্যা মামলা দায়ের করে, গ্রেফতার করে বন্দি অবস্থায় নির্যাতন করে এক বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করেছিল। বিএনপি-জামাত জোট সরকারের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও মানবাধিকার লংঘনের প্রতিবাদে শত নির্যাতন সত্ত্বেও আমরা সব সময় প্রতিবাদ করেছি, আদালতে মামলা দায়ের করেছি এবং এই ধরনের নির্যাতন বন্ধের জন্য অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি দাবি করেছি।

১৯৭৫-এ স্বাধীন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানকারী তাঁর সহযোগীদের হত্যার পর বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে ইনডেমনিটি আইন জারি করে সভ্যতার ইতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার থেকে অব্যাহতি দিয়ে বাংলাদেশে অপরাধ থেকে দায়মুক্তির অপসংস্কৃতি চালু করেছেন, যার চরম পরিণতি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি জোট সরকরের জমানায়। বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসে যখনই এসব অপরাধের তদন্ত ও বিচারের কথা বলেছে জামাত বিএনপি কোরাসে বলছে এসব নাকি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা।

২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে বিএনপি-জামাত জোট সরকার সংখ্যালঘু নির্যাতনের পাশাপাশি বাংলাদেশকে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মতো তালেবানি রাষ্ট্র বানাবার জন্য হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন গৃহে অগ্নিকসংযোগ, লুণ্ঠন প্রভৃতি মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছিল সে সবের তদন্ত করার জন্য বর্তমান মহাজোট সরকার একটি বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করেছিল। প্রাক্তন জেলা জজ মুহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্যের এই কমিশন গত ২৪ এপ্রিল (২০১১) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তাদের রিপোর্ট প্রদান করেছে। প্রকাশের আগেই বিএনপি এই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেছে, যেমনটি করেছিল তাদের ক্ষমতায় থাকাকালে যাবতীয় হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা অস্বীকার করে।

জোট সরকারের আমলে আমরা এ বিষয়ে অনেকগুলো সেমিনার ও আলোচনা সভা করেছি, তিন খণ্ডে প্রায় ৩ হাজার পৃষ্ঠার শ্বেতপত্র করেছি, অন্ততপক্ষে ৬টি পুস্তিকা প্রকাশ করেছি— এই নির্যাতন সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করে উপযুক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য।

শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ৮২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার মূল কারণ, এর অভিব্যক্তি এবং নির্মূলনের উপায় নির্ধারণের জন্য যে আলোচনা সভার আয়োজন করেছি সেখানাকার দুই প্রধান বক্তা নির্মূল কমিটির নির্বাহী সভাপতি শাহরিয়ার কবির ও সহ সভাপতি মুনতাসীর মামুনের লিখিত বক্তব্যসহ প্রাসঙ্গিক পুরনো কয়েকটি লেখা এই সংকলনে প্রকাশ করা হল। আমরা মনে করি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার এবং শাস্তির পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সংবিধান পুনঃপ্রবর্তন, যার জন্য প্রায় দুই দশক আমরা আন্দোলন করছি।

গত ৬ মে নির্মূল কমিটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কাজী নূরউজ্জামান মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে কেন্দ্রের শোকবার্তায় বলা হয়েছে— মুক্তিযুদ্ধের ৭ নম্বর সেক্টর অধিনায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা মহান দেশপ্রেমিক লে. কর্ণেল (অবঃ) কাজী নূর-উজ্জামানের মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। ১৯৯১ সালে যুদ্ধাপরাধী ও পাকিস্তানি নাগরিক গোলাম আযমকে জামায়াতী ইসলামীর আমীর ঘোষণার পর সারাদেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। এই বিক্ষোভেরই ফলশ্রুতি ছিল 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি', যার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন কর্ণেল জামান। তিনি ছিলেন নির্মূল কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী। ১৯৯২-এর ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যোনে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচারের জন্য শহীদজননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যে গণআদালত বসেছিল কর্ণেল জামান ছিলেন তার অন্যতম বিচারক। '১৯৮০ সালে কর্ণেল জামান যখন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান ছিলেন তখন বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধী ও পাকিস্তানি নাগরিক গোলাম আযমের আগমনের প্রতিবাদে দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান কর্ণেল জামান বাংলাদেশে জামাতে ইসলামীর রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এরপর কর্ণেল জামান ও শাহরিয়ার কবির গঠন করেছিলেন 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ কেন্দ্র', যে সংগঠন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল '৭১-এর যুদ্ধাপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধীদের দুষ্কর্ম সম্পর্কে প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ 'একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়'। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে 'সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম' গঠনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন কর্ণেল জামান।

কর্ণেল জামানের মৃত্যুতে জাতি হারিয়েছে এক মহান মুক্তি সংগ্রামীকে, আমরা হারিয়েছি আমাদের আন্দোলনের পথপ্রদর্শক ও পুরোগামী নেতাকে। আমরা তাঁর পরিবারের শোক সন্তপ্ত সদস্য ও সহযোদ্ধাদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি।'

কাজী মুকুল
সাধারণ সম্পাদক

জোট সরকারের নির্যাতন এবং অপরাধ থেকে দায়মুক্তির সংস্কৃতি

শাহরিয়ার কবির

মানবসভ্যতার উষালগ্ন থেকে সমাজে অপরাধীর শাস্তির বিধান প্রচলিত রয়েছে অপরাধের পুনরাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ এবং অপরাধ সম্পর্কে ঘৃণার বোধ সৃষ্টির জন্য। তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমরা দেখেছি অপরাধ দমনের জন্য দেশে দেশে শত শত আইন প্রণীত হয়েছে এবং সাধারণভাবে অপরাধীদের আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে কিন্তু ক্ষমতাবান অপরাধীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচার থেকে অতীতে যেমন অব্যাহতি পেয়েছে, একইভাবে এখনও পাচ্ছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে অপরাধ থেকে দায়মুক্তির সংস্কৃতি আরম্ভ হয়েছে সেদিন থেকে, যেদিন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের ভেতর সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ১৯৫ জন পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাকে ক্ষমা করেছিলেন। গণহত্যা আন্তর্জাতিক আইনে এমন এক অপরাধ যার কোনও ক্ষমা হয় না। গণহত্যা পৃথিবীর যে কোন দেশে ঘটুক তার বিচার হতে হবে— এটি একটি সর্বমান্য আন্তর্জাতিক আইন, যাকে আইনের পরিভাষায় বলা হয় Jus Cogens। মহাজোট সরকার যখন থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তখন থেকে যুদ্ধাপরাধীদের প্রধান দল জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের সহযোগীরা বলছে প্রধান অভিযুক্তদের ছেড়ে দিয়ে সহযোগীদের বিচার করা যায় না।

এ বিষয়ে আমরা বলেছি— ১) ১৯৭১-এর যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ, গণহত্যা ইত্যাদি সংঘটিত হওয়ার সময় জামায়াত শুধু দখলদার পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সহযোগী ছিল না, নিজেরাও পাকিস্তান সরকারের অংশ ছিল এবং রাজাকার, আলবদর, আলশামস প্রভৃতি ঘাতক বাহিনী গঠন করে গণহত্যাযজ্ঞে অংশগ্রহণ করেছে। ২) ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিকে যুদ্ধাপরাধের জন্য বিচার না করে ক্ষমা করার কোন আইনগত ভিত্তি দেশীয় আইনে নেই, আন্তর্জাতিক আইনেও নেই। আদালত কর্তৃক দণ্ডিত কোন ব্যক্তির দণ্ড রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করতে পারেন কিন্তু অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন না। ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে ১৯৫ জনের ক্ষমা ছিল সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। সংবিধান অনুযায়ী এ চুক্তি কখনও বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে উত্থাপিত, আলোচিত ও গৃহীত হয়নি। যার ফলে এই চুক্তির কোন আইনগত গ্রহণযোগ্যতা নেই। এবং ৩)

যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ১৯৫ জন পাকিস্তানির বিচার করা হয়নি বা তাদের 'ক্ষমা করে হয়েছে' বলে বাংলাদেশী যুদ্ধাপরাধীরা তাদের অপরাধের দায় থেকে মুক্তি পাবে— এটা কোনও সভ্য সমাজে গ্রহণীয় হতে পারে না।

বাংলাদেশী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল বঙ্গবন্ধুর সরকার। তাঁর হত্যাকাণ্ডের পর ক্ষমতায় এসে জেনারেল জিয়াউর রহমান সেই বিচার বন্ধ করে যুদ্ধাপরাধী, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী ও গণহত্যাকারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বপ্রদানকারী তাঁর সহযোগীদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য যারা দায়ী তাদের বিচার বন্ধের জন্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে জেনারেল জিয়া এবং তাঁর দল বাংলাদেশে অপরাধ থেকে দায়মুক্তির জঘন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। জিয়ার এই ইনডেমনিটি আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজের ললাটে ঘাতকের রাষ্ট্র ও সমাজের কলঙ্কচিহ্ন এঁকে দিয়েছিল, যে কলঙ্ক থেকে আমাদের মুক্ত করেছে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার। ১৯৯৬ সালে প্রথমবার ক্ষমতায় এসে এই সরকার ইনডেমনিটি বাতিল করে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার আরম্ভ করেছিল। মাঝখানে বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় এসে সেই বিচার নানাভাবে বিঘ্নিত করেছে। অবশেষে ২০০৮ সালের ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আসার পর '৭৫-এর ঘাতকদের বিচার সম্পন্ন হয়েছে।

অপরাধের দায়মুক্তির কলঙ্ক থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার জন্য স্বাধীনতার প্রায় ৪০ বছর পর আবারও আরম্ভ হয়েছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া, যাদের বিচার বন্ধ করে দিয়েছিলেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়া। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ছিল ২০০৮-এর ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোটের অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার, যার প্রতি বাংলাদেশের ব্যাপক জনসমর্থনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে জাতীয় সংসদে তিন চতুর্থাংশেরও অধিক আসনে মহাজোট প্রার্থীদের ঐতিহাসিক বিজয়ে।

অপরাধ থেকে দায়মুক্তির সংস্কৃতির অবসান ঘটানোর জন্য মহাজোট সরকার বিগত জোট সরকারের আমলে সংঘটিত নজিরবিহীন সংখ্যালঘু নির্যাতন এবং অন্যান্য মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা তদন্ত করার জন্য উচ্চতর আদালতের নির্দেশে একটি কমিশন গঠন করেছিল ২০০৯ সালেই। অবসরপ্রাপ্ত জেলাজজ মুহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের নেতৃত্ব গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট এই কমিশন গত ২৪ এপ্রিল ২০১১ তারিখে তাদের দীর্ঘ প্রতিবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে প্রদান করেছে। পরদিন দেশের শীর্ষস্থানীয় সকল জাতীয় দৈনিকে এই সংবাদ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক 'কালের কণ্ঠে' প্রকাশিত প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'বিএনপি-জামায়াত নেতারা সংখ্যালঘু নির্যাতন করেন'। এই প্রতিবেদনের উপশিরোনাম— '২০০১-এর নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা : বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন'।

২৫ এপ্রিল ২০১১ তারিখে প্রকাশিত 'কালের কণ্ঠে'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে— 'বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন নেতার প্রত্যক্ষ মদদে ২০০১ সালের নির্বাচনোত্তর সহিংস ঘটনা ঘটে। ওই সব ঘটনা তদন্তে গঠিত বিচার বিভাগীয় কমিশনের প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায় এবং তখনকার বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের ওপর নির্যাতনের মদদদাতা হিসেবে কমিশন বিএনপি-জামায়াত জোটের বেশ কয়েকজন নেতার নামও উল্লেখ করেছে। তাঁদের মধ্যে আছেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ, বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী, সাবেক পরিবেশমন্ত্রী তরিকুল ইসলাম, খাগড়াছড়ির সাবেক এমপি ওয়াদুদ ভূঁইয়া, বিএনপি নেতা হাফিজ ইব্রাহীম, সাবেক এমপি নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টু, সাবেক শিল্পমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী ও জামায়াত নেতা মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

'প্রতিবেদনে বিএনপি-জামায়াত জোটের ১৮ হাজার নেতা-কর্মীকে ২০০১ সালের নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতার মদদদাতা হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে সহিংসতায় অংশ নেন। চিহ্নিত এসব নেতা-কর্মীকে আইনের আওতায় নেওয়ারও সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।'

'৭১-এর গণহত্যাকারী ও যুদ্ধাপরাধী থেকে আরম্ভ করে বাংলাদেশে যাবতীয় অপরাধীদের রক্ষাকারী সংগঠন বিএনপি যথারীতি সাহাবুদ্দিন কমিশনের তদন্ত প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে, যেভাবে তারা বিরোধিতা করছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের কার্যক্রম।

২৯ এপ্রিল (২০১১) বিএনপির সংবাদ সম্মেলনে সাহাবুদ্দিন কমিশনকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ আখ্যায়িত করেছেন 'আওয়ামী লীগের একটি ক্রীড়নক কমিটি' হিসেবে। 'প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করল বিএনপি'— এই শিরোনামে প্রকাশিত দৈনিক 'সমকাল'-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে— '২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতার ঘটনায় সরকারি তদন্ত প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে বিএনপি। দলটির অভিযোগ, এই তদন্ত প্রতিবেদন 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক ও পক্ষপাতদুষ্ট'। আওয়ামী লীগ হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ওইসব ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক সংঘাত বলে ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে। এটি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। গতকাল শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে তদন্ত প্রতিবেদন নিয়ে স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ দলীয় অবস্থান জানান।

'মওদুদ আহমদ বলেন, ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন-পরবর্তী ঘটনায় বিএনপি আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় কিছু কর্মী আক্রান্ত হয়। যার মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনও ছিল। একে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হিসেবে চিহ্নিত করার কোনো সুযোগ নেই। সংঘাতের ঘটনাগুলো ছিল রাজনৈতিক; সরকার ওইসব ঘটনার দায় বিএনপির ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। তার অভিযোগ, বিএনপির জনপ্রিয় নেতাদের আগামী নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে সরকার হিন্দু নির্যাতনের নামে মিথ্যা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। বিরোধী দলের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে তথাকথিত প্রতিবেদন সরকারের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়। তাদের ব্যর্থতা ও অপশাসনের বিরুদ্ধে বিরোধী দল যাতে আন্দোলন করতে না পারে সে লক্ষ্যে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে নেতাকর্মীদের হয়রানি করাই প্রতিবেদনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

'তিনি বলেন, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ওই সহিংস ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা, আসামিদের গ্রেফতার ও শাস্তির ব্যবস্থা নিয়েছে। ফলে ওই সময় এসব বিষয়ে আওয়ামী লীগের ফায়দা হাসিলের অপচেষ্টা অঙ্কুরেই ভণ্ডুল হয়ে যায়; কিন্তু এবার ক্ষমতায় এসে আবারও সেই পুরনো অপকৌশল অবলম্বন করেছেন তারা। তদন্ত কমিটির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সাবেক আইনমন্ত্রী। বলেন, এটি আওয়ামী লীগের একটি ক্রীড়নক কমিটি ছাড়া অন্য কিছুই নয়।'

কোনও কালে কোনও দেশে ঘাতক, ধর্ষক, নির্যাতকরা কখনও স্বীকার করেনি যে তারা এসব অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। কোনও নিরাপরাধ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সংগঠনের বিরুদ্ধে কেউ যদি কোনও মিথ্যা অভিযোগ আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করে তার প্রতিকার হচ্ছে আইনের আশ্রয় গ্রহণ যা মওদুদ আহমদের মতো বিজ্ঞ আইনজীবীর অজানা থাকার কথা নয়। জাতীয় সংসদে না গিয়ে, আদালতে না গিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার আগেই বিএনপি কাকাতুয়ার শেখানো বুলির মতো সাহাবুদ্দিন কমিশনের তদন্ত প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে। এই মিথ্যাচার বিএনপির পুরনো অভ্যাস যা এখন মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছে।

ক্ষমতায় থাকাকালে মওদুদ আহমদদের চার দলীয় জোটের দুষ্কর্ম এবং মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা সম্পর্কে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' কয়েকটি গ্রন্থ, পুস্তিকা ও ইশতেহার ছেপেছে, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি। সেই তুলনায় সাহাবুদ্দিন কমিশনের প্রতিবেদনে অনেক কমই বলা হয়েছে। ২০০১ সাল থেকে সংবাদপত্রে বা অন্যত্র বিএনপি-জামায়াতের দুষ্কর্ম সম্পর্কে যখনই কিছু লেখা হয়েছে মওদুদ আহমদরা সব সময় রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের পাগলা মেহের আলীর মতো বলেছেন, 'সব ঝুটা হ্যায়।'

২০০১-এর ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নজিরবিহীন সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের উপর হামলা-হত্যা-নির্যাতন, ভিন্নমতের বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর দমন-পীড়ন— '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ছাড়া অতীতে কখনও প্রত্যক্ষ করিনি। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের হুমকি প্রদর্শন এবং বিভিন্ন স্থানে তাদের উপর হামলার খবর পাওয়া গিয়েছিল নির্বাচনের তিন মাস আগে বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে।

বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের, বিশেষভাবে হিন্দু সম্প্রদায়কে গণ্য করা হয় আওয়ামী লীগের 'ভোট ব্যাংক' হিসেবে। যে কারণে নির্বাচনের আগে তাদের

আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেয় আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিপক্ষ সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীরা, যাদের প্রধান দল হচ্ছে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০০৮-এর সর্বশেষ নির্বাচন ছাড়া ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১-এর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কম-বেশি ঘটনা সেই সময়ের সংবাদপত্রেই পাওয়া যাবে।

২০০১ সালে আমরা লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল থেকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিচ্ছিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে বিভিন্ন দৈনিকে লিখেছি এবং সাম্প্রদায়িক দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছি। লতিফুর রহমানের সরকার অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবর্তে ব্যস্ত ছিল চার দলীয় জোটের নীলনকশা অনুযায়ী নির্বাচন আয়োজনে। ক্ষমতায় এসেই তারা ১৩ জন সচিবকে তাৎক্ষণিকভাবে বদলি করে প্রশাসন দলীয়করণের এক উৎকট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। ১ অক্টোবর নির্বাচনের দিন আমরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে— বিশেষভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভোটকেন্দ্রে গিয়ে দেখেছি সরকার ও প্রশাসন আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের নির্বাচনে হারাবার জন্য কী ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে। এমনকি সামরিক বাহিনীকে পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছিল চার দলীয় প্রার্থীদের বিজয়ী করার কাজে। এর কিছু বিবরণ রয়েছে আমার প্রামাণ্যচিত্র 'আমাদের বাঁচতে দাও' এবং সেই সময়ের সংবাদপত্রে।

১ অক্টোবরের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা আরম্ভ হয়েছিল বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার তা শুধু অস্বীকার করেনি, যারা এর প্রতিবাদ করেছেন— বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় তাদের গ্রেফতার করে নির্যাতন করেছে, যার বহুল আলোচিত একটি উদাহরণ অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন ও আমার কারানির্যাতনের ঘটনা। প্রথাবিরোধী লেখক অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ নির্বাচনকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক সহিংসতার উপর একটি উপন্যাস লিখেছিলেন 'পাক সার জমিন' নামে। জামায়াতের নির্দেশে মৌলবাদী ঘাতকরা তাকে তলোয়ার দিয়ে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। মুনতাসীর মামুন ও আমি শতাধিক প্রতিবেদন ও কলাম লিখেছি জোট সরকারের যাবতীয় মানবতাবিরোধী অপরাধ সম্পর্কে, যার খেসারত আমাদের দিতে হয়েছে অত্যন্ত চড়া মূল্যে।

সেই সময় আওয়ামী লীগ যেভাবে মার খাচ্ছিল— রুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না। অন্যান্য রাজনৈতিক দল মৃদু প্রতিবাদ করলেও কার্যকর প্রতিরোধ রচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। একইভাবে ব্যর্থ হয়েছে ডঃ ইউনূস, ডঃ কামাল হোসেন ও ডঃ মোজাফফর আহমেদদের নেতৃত্বাধীন সুশীল সমাজ। তারা ১ অক্টোবরের নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু বলে সনদ দিয়েছেন। আমাদের গ্রেফতারের পর কামাল হোসেন মৃদু প্রতিবাদ করলেও শান্তির জন্য নোবেলবিজয়ী ইউনূস টুঁ শব্দটি করেননি বিরাজমান কবর/শ্মশানের চিরশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায়। বরং লতিফুর রহমানের দলবাজিকে তিনি পিঠ চাপড়ে সমর্থন জানিয়েছেন। প্রতিবাদ

করেছিল দেশের সংবাদপত্রগুলো। চারদলীয় জোটের কয়েকটি মুখপত্র ছাড়া সকল জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকে দিনের পর দিন প্রকাশিত হয়েছে খালেদা-নিজামীদের নজিরবিহীন নৃশংসতার বিবরণ, যার একটি অংশ পাওয়া যাবে সাহাবুদ্দিন কমিশনের সহস্রাধিক পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে। প্রকৃতপক্ষে মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে তখন সংবাদপত্রের এই বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে সংখ্যালঘু নির্যাতনের মাত্রা ধীরে ধীরে কমে এসেছিল, যার বিপরীতে বৃদ্ধি পেয়েছিল জঙ্গী মৌলবাদীদের গ্রেণেড-বোমা হামলা, হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা।

চার দলীয় জোট সরকারের আমলে জামায়াতে ইসলামী এবং সরকারের শীর্ষ নেতাদের প্রত্যক্ষ মদদে সারা দেশে শতাধিক জঙ্গী মৌলবাদী সংগঠনের জন্ম হয়েছিল, যারা ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, উন্নয়নকর্মী, সমাজকর্মী ও সংস্কৃতিকর্মী সহ নিরীহ মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করেছে কিংবা চিরজীবনের মতো পঙ্গু করে দিয়েছে। জঙ্গী মৌলবাদীদের গ্রেণেড-বোমা হামলা থেকে হযরত শাহজালালের মাজার সহ বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও পীরের মাজারও রেহাই পায়নি। জামায়াত ও প্রশাসনের মদদে জামাতুল মুজাহিদীনের বাংলা ভাইরা রাজশাহীতে শরিয়া আদালত গঠন করে আওয়ামী লীগ ও বাম রাজনৈতিক দলের কর্মীদের হত্যা করেছে, পিটিয়ে হাত-পা ভেঙে দিয়েছে। ২০০৪-এর ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসবিরোধী জনসভায় জামায়াত-বিএনপির শীর্ষ নেতাদের নির্দেশ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী হরকতুল জেহাদের জঙ্গীরা উপর্যুপরি গ্রেণেড নিক্ষেপ করে কেন্দ্রীয় নেত্রী আইভী রহমান সহ ২৪ জন কর্মীকে হত্যা করেছে এবং তিন শতাধিক নেতাকর্মীকে আহত করেছে। আহতদের তালিকায় দলের প্রধান শেখ হাসিনা সহ শীর্ষ নেতাদের অনেকেই ছিলেন। হরকতুল জেহাদের শীর্ষ নেতা মুফতি হান্নান বলেছেন কীভাবে বিএনপি ও জামায়াতের নেতা তারেক রহমান, বাবর, হারিস, পিন্টু ও আলী আহসান মুজাহিদরা মিলে শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য এই গ্রেণেড হামলা সংঘটিত করেছিলেন।

খালেদা-নিজামীদের আমলে যে সব গ্রেণেড-বোমা হামলা, হত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংযজ্ঞের ঘটনা ঘটেছে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও জোটের নেতারা নিজেদের সম্পৃক্তি অস্বীকার করার পাশাপাশি এর জন্য তাৎক্ষণিকভাবে দায়ী করেছেন আওয়ামী লীগ ও ভারতকে। ২১ আগস্টের নৃশংস হামলার পর তারা বলেছিলেন এর জন্য আওয়ামী লীগ ও ভারত দায়ী, নইলে শেখ হাসিনা রেহাই পেলেন কীভাবে! এই ঘটনার সঙ্গে ভারত-আওয়ামী লীগকে যুক্ত করার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছিল জজ মিয়া নামক নোয়াখালীর এক নগণ্য আওয়ামী লীগ কর্মী এবং সদ্য ভারত প্রত্যাগত এক হিন্দু যুবক পার্থ সাহাকে। ২০০২ সালের ৭ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের ৩টি সিনেমা হলে জঙ্গী মৌলবাদীদের বোমা হামলা ও হত্যাকাণ্ডের কয়েক ঘন্টার ভেতর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছিল মুনতাসীর মামুন ও আমাকে। রিমান্ডে নিয়ে আমাদের

উপর নির্যাতন করা হয়েছে— ময়মনসিংহের সিনেমা হলে বোমা হামলার জন্য আওয়ামী লীগ ও ভারত দায়ী— এটা লিখিতভাবে বলার জন্য। একইভাবে হুমায়ুন আজাদের উপর হামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ কর্মী আব্বাসকে, যার ছাত্রজীবনের একটানা দুটি বছর কেটেছে কারাগারের অন্তরালে।

চারদলীয় জোটের আমলে নজিরবিহীন সংখ্যালঘু নির্যাতন এবং আমাদের গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানিয়েছিল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। ২০০১-এর নবেম্বরে আমার প্রথম দফা গ্রেফতারের পর এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব বাংলাদেশে এসে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা তৎকালীন জোট সরকারকে নির্যাতন বন্ধের আহ্বান জানিয়েছিল। এমনকি উচ্চতর আদালতও সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল নির্যাতন বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার এর কোনটাইকেই হিসেবের মধ্যে আনেনি।

সেই সময় দশ হাজারেরও বেশি হত্যা, সন্ত্রাস ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল, কিন্তু মামলা গ্রহণ করা হয়েছে হাতে গোনা কয়েকটি। শতকরা ৯০ ভাগ আক্রান্ত ভুক্তভোগী প্রাণভয়ে মামলা করেনি। যারা সাহস করে মামলা করার জন্য থানায় গিয়েছিল তাদের ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। বহুল আলোচিত পূর্ণিমা ধর্ষণ মামলার অভিযোগ যথারীতি উল্লাপাড়া থানা গ্রহণ করেনি বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের অলিখিত নিষেধাজ্ঞার কারণে। পরে সিরাজগঞ্জের সাংবাদিক এবং নির্মূল কমিটির নেতারা পূর্ণিমার বাবাকে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গেছেন। সিভিল সার্জনের রিপোর্ট পাওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেট থানাকে নির্দেশ দিয়েছেন অভিযুক্তদের গ্রেফতারের জন্য। ধর্ষকরা ক্ষমতাসীন চার দলীয় জোটের কর্মী এবং বিএনপির স্থানীয় এমপি আলী আকবরের আশ্রয়ে ছিল। দলীয় কর্মীদের বাঁচাবার জন্য আলী আকবর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বলে মামলার পুনর্তদন্ত করিয়ে পূর্ণিমার দুঃসময়ে যারা তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের ধর্ষণ মামলার আসামী বানিয়ে গ্রেফতার করিয়েছেন। এই গ্রেফতারের তালিকায় নির্মূল কমিটির সিরাজগঞ্জের আহ্বায়ক আমিনুল ইসলামও ছিলেন। এ ধরনের হয়রানির ভয়ে সন্ত্রাসী ঘাতকদের বিরুদ্ধে মামলা করার সাহস পায়নি ভুক্তভোগীরা। কয়েকজন প্রথমে সাহস করে মামলা করেছেন, কিন্তু পরে সরকারি জোটের নেতাদের হুমকির কারণে প্রাণ বাঁচাবার জন্য সেই মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

গত ৩০ এপ্রিল ২০১১ তারিখে জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র দৈনিক 'সংগ্রাম'-এর প্রধান শিরোনাম ছিল 'আওয়ামী লীগ সরকারের সোয়া দুই বছর ঃ সংখ্যালঘু নির্যাতনের শিকার ৮১৩ ঃ প্রতিমা ভাঙচুর ৫১টি মন্দিরে ঃ অধিকাংশ ঘটনার সাথে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মী জড়িত।' মানবাধিকার সংগঠন

'অধিকার'-এর একটি প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে 'সংগ্রাম' এই খবর প্রকাশ করেছে।

বর্তমান মহাজোট আমলে সংখ্যালঘু নির্যাতন হচ্ছে না এমন কথা আমরা কখনও বলি না। বিভিন্ন দৈনিকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সংবাদ আমরা দেখছি, যা বিএনপি-জামায়াত জোটের জমানার চেয়ে অনেক কম হলেও এসব ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। জোট এবং মহাজোটের আমলে সংখ্যালঘু নির্যাতন এবং মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার ভেতর একটি মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে তখন ভুক্তভোগীরা থানায় গিয়ে অভিযোগ জানাতে পারেনি, যারা সাহস করে গেছে তাদের অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি। মহাজোটের আমলে এ ধরনের অপরাধ করে জোটের আমলের মতো অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এখন অভিযুক্তদের গ্রেফতার এবং বিচারের ঘটনাও আমরা বিভিন্ন পত্রিকায় দেখছি, যা চারদলীয় জোটের জমানায় ছিল বিরল ঘটনা।

এই আলোচনার আরম্ভেই বলেছি বিচার না করলে অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকবে। জোটের আমলের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের বিচার হলে এই আমলে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, মন্দির ও মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনা এভাবে ঘটত না। বর্তমান মহাজোটের আমলের দুস্কৃতকারীদের শাস্তির জন্য হলেও মওদুদ আহমদদের উচিৎ সাহাবুদ্দিন কমিশনের প্রতিবেদনকে স্বাগত জানানো, তাদের সুপারিশ অনুযায়ী সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা এবং মহাজোটের আমলের সমচরিত্রের ঘটনা তদন্তের জন্য অনুরূপ আরেকটি কমিশন গঠনের কথা বলা।

জোট সরকারের আমলে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় তিন লক্ষ সদস্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। কোন পরিস্থিতিতে তারা মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তা জানার জন্য আমি একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম এবং ভারতে গিয়ে ভিডিও ক্যামেরায় তাদের জবানবন্দি ধারণ করেছিলাম। দেশে ফেরার পর ২২ নবেম্বর ২০০১ তারিখে বিমানবন্দরে আমাকে গ্রেফতার করেছিল খালেদা-নিজামীদের জোট সরকার, কেড়ে নিয়েছিল আমার ক্যামেরা, টেপ, স্থিরচিত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী। জোট সরকার প্রথমে আমাকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়েছিল, পরে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করেছিল। জোট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে আমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার কোন অভিযোগ আনতে পারেনি। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে উচ্চতর আদালত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই মিথ্যা ষড়যন্ত্র মামলা খারিজ করে দেয়।

তখন যারা জোট সরকারের নৃশংসতার শিকার হয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাদের কেউ কেউ দেশে ফিরলেও অনেকে এখনও ভারতে রয়ে গেছেন। গত মার্চে (২০১১) একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য কলকাতায় গিয়েছিলাম। পত্রিকায় খবর পেয়ে তাদের কয়েকজন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, জানতে চেয়েছেন তারা আদৌ দেশে ফিরতে পারবেন কিনা।

২০০১ সালে ভারত সফরকালে আমি তাদের বলেছিলাম পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তারা নিশ্চয়ই দেশে ফিরতে পারবেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে প্রায় সাড়ে চার বছর— এখনও অনেকে দেশে ফিরতে পারেন নি। ভারত সরকার তাদের শরণার্থীর মর্যাদা না দেয়ায় তারা জানেন না কীভাবে তারা দেশে ফিরবেন। আমি আশা করব আগামী আগস্টে ভারতের প্রধানমন্ত্রী যখন বাংলাদেশ সফরে আসবেন তখন এ বিষয়টিও দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী মানবিক কারণে বিবেচনা করবেন। কারণ দেশত্যাগে বাধ্য হওয়া বাংলাদেশের নাগরিকদের দেশে প্রত্যাবর্তন জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদসম্মত অধিকার। আমি জানি না সাহাবুদ্দিন কমিশনের প্রতিবেদনে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য কিংবা সুপারিশ করা হয়েছে কি না।

চার দলীয় জোট সরকারের আমলে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করার জন্য 'অপারেশন ক্লিনহার্ট'-এর নামে সামরিক বাহিনী ও পুলিশ বাহিনী যে সব হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের সরকারিভাবে ইনডেমনিটি দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ অর্ধশতাধিক মানুষকে যারা ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছে এবং কয়েকশ মানুষকে নির্যাতন করে পঙ্গু বানিয়েছে তাদের কখনও বিচার হবে না। গ্রেফতারের পর সেনা-পুলিশ হেফাজতে যে সব মৃত্যু ঘটেছে তার তদন্ত এবং দায়ী ব্যক্তিদের না হওয়ার কারণে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এখনও বন্ধ হয়নি।

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন ও আমি চার দলীয় জোট সরকারের বিরুদ্ধে পাঁচ কোটি টাকার যে ক্ষতিপূরণ মামলা করেছি সেখানে আমরা ২৮ জন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলেছি ক্ষতিপূরণের অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দেয়ার নিয়ম বন্ধ করতে হবে। ক্ষতিপূরণ দিতে হবে সরকার ও প্রশাসনের সেই সব ব্যক্তিদের পকেট থেকে, যারা সংবিধান ও আইন বহির্ভূত নির্যাতন ও লাঞ্ছনার জন্য দায়ী। যতদিন সরকার ও প্রশাসনের বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত নির্যাতকদের ব্যক্তিগতভাবে নির্যাতনের জন্য দায়ী করে শাস্তি দেয়া হবে না ততদিন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও নির্যাতনও বন্ধ হবে না।

বহুল আলোচিত পূর্ণিমা ধর্ষণ মামলার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত রায়ে ১১ জন অপরাধীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের পাশাপাশি এক লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে এবং জরিমানার অর্থ পূর্ণিমাকে প্রদানের জন্য বলা হয়েছে। এই যুগান্তকারী রায় ভবিষ্যতে নির্যাতিত নারীদের আইনের আশ্রয়গ্রহণে সাহসী করবে বলে আমরা মনে করি। ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে ধর্ষণ যেমন বন্ধ হবে না, ধর্ষিতাদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ও নিরাপত্তা না দিলে তারা আদালতে যেতে আগ্রহী হবে না।

এ কথা আমরা বহুবার বলেছি বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন এবং জঙ্গী মৌলবাদের উত্থানের অন্যতম কারণ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভাস্বর '৭২-এর ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধানের পাকিস্তানিকরণ বা তথাকথিত ইসলামীকরণ। বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর দুই উর্দিপরা জেনারেল জিয়া ও এরশাদ ৫ম ও

৮ম সংশোধনীর দ্বারা সংবিধানের যে সাম্প্রদায়িকীকরণ করেছেন জোট সরকারের আমলে তারই মাশুল দিতে হয়েছে, যার জের এখনও চলছে। এখনও চরম সাম্প্রদায়িক কালাকানুন 'অর্পিত সম্পত্তি আইন' বাতিল করা হয়নি, সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ...', 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' ইত্যাদি কলঙ্ক বহাল রাখার কথা বলছেন মহাজোট সরকারের শীর্ষ নেতারা। জিয়া এরশাদের আধা-পাকিস্তানি, কদর্য সাম্প্রদায়িক সংবিধান বাংলাদেশকে মধ্যযুগীয় তামসিকতার পথে ঠেলে দিচ্ছে। এই মানবতাবিরোধী সংবিধান বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার পাশাপাশি নৌকাশূন্যও করবে। মহাজোটের নেতৃবৃন্দ এবং সরকারের নীতি নির্ধারকরা যদি এই সত্য উপলব্ধি করতে না পারেন— দেশ ও জাতি সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না।

১২ মে ২০১১

জঙ্গী মৌলবাদীদের হামলায় নিহতদের পরিবার, আহত ও নির্যাতিতদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে ১৬ মার্চ ২০০৬ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির সূচনা বক্তব্য প্রদান করছেন। মঞ্চে উপবিষ্ট (ডান থেকে) এডভোকেট মাহবুবে আলম, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, অধ্যক্ষ মতিউর রহমান, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক মোঃ ইউনুসের স্ত্রী রাবেয়া খাতুন, কবি শামসুর রাহমান, সাংবাদিক এনামুল হক চৌধুরী ও ছাত্রলীগ নেতা আবু আব্বাস ভূঁইয়া

পূর্ণিমা কিভাবে আমাদের চড় মেরেছিল

মুনতাসীর মামুন

এগারো বছর আগের সেই ছবিটি লাফ দিয়ে চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। চোখে পানি চলে এলো। এ ছবিটি দেখলেই আমার চোখ ভিজে যায়। আজ চোখ ভিজে গেলেও মনে মনে সন্তুষ্টও হয়েছি। একযুগ সংগ্রাম করতে হয়েছে, কিন্তু আমরা জিতেছি তো। মনটা একটু বিষণ্ন হলো এ কারণে যে, ওয়াহিদুল হক নেই। থাকলে তার চেয়ে বেশি খুশি কেউ হতো না। খুশি এ কারণেও যে, শাহরিয়ার কবির ও নির্মূল কমিটির অনেকে বেঁচে আছেন, যাঁরা একযুগ একপাল নরপশুর বিরুদ্ধে জীবনবাজি রেখে লড়াই করেছিলেন। এজন্যই কি বলা হয়— সত্য এক সময় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঘটনাটি আপনাদের অনেকের হয়ত মনে নেই। না থাকারই কথা। প্রতিদিন নতুন ঘটনা আগের দিনের খবরকে সরিয়ে দিচ্ছে কাগজের পাতা থেকে। গত ৫ মে সংবাদপত্রের পাতায়ই খবরটি শিরোনাম হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হয়নি, প্রথম পাতায় হয়ত ছিল। এখানেই বর্তমান সংবাদপত্রের ঝোঁক কোনদিকে তা বোঝা যায়। জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ ও সংবাদেই ঘটনাটি শিরোনাম হয়েছিল। গরিব কাগজগুলো এখনও গরিবের কথা বলে। কমিটমেন্টটা বজায় রেখেছে। বড়লোকের কাগজ শুধু সুশীল সমাজকেই গুরুত্ব দেয়।

২০০১ সালের অক্টোবর মাসের ৮ তারিখে ঘটনাটি ঘটেছিল। অক্টোবরের মাঝামাঝি ঘটনাটি খবরে এসেছিল। সেই সময়ও এ তিনটি কাগজই আবার শিরোনাম করেছিল। বড়লোকী কাগজগুলো তখন তা এড়িয়ে গেছে। কারণ তখন তারা মাত্র খালেদা-নিজামীকে ক্ষমতায় এনেছে। তখন এই জনকণ্ঠেই (২৪-১০-২০০১) আমার একটি ভাষ্য প্রকাশিত হয়েছিল, নাম 'কাফ্‌ফারা সবাইকে দিতে হবে আগে অথবা পরে।' ঐ সময়টা মনে আছে আপনাদের? পাকি-বাঙালীদের নেতৃত্বে তখন খালেদা-নিজামী। তাঁরা সবেমাত্র লুট, ধর্ষণ, জ্বালাও-পোড়াওর রাজনীতি শুরু করেছেন। ঐ সময়টি মনে করিয়ে দেয়ার জন্য সেই ভাষ্যের খানিকটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি—"ছবিটি অনেকে দেখেছেন, জনকণ্ঠ বা সংবাদের পাতায়। সংবাদের প্রথম পৃষ্ঠার ঐ ছবিটি পূর্ণিমার, যখন চোখে পড়ল সকালে, তখন আপনা-আপনি চোখে পানি চলে এলো। কিন্তু কেন? এত বছর— এত বিপর্যয়, এত হুমকির মুখেও তো কখনও বিপর্যস্ত বোধ করিনি। খানিকপর অনুধাবন করলাম, আমার বা আমাদের বন্ধুদের অনেকের তো একটি পূর্ণিমার বয়সী এবং আমি ভেবেছিলাম, এ ছবিটি তো আমার মেয়েরও হতে পারত, যাঁরা

মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে বেঁচে ছিলেন, তাঁদের অনেকে সমষ্টিগত ডিপ্রেশনে ভুগছেন। পূর্ণিমার একটি ছবি মুখঢাকা দু'হাত দিয়ে কিন্তু কী সাহস, এসে হাজির হলো আমাদের সামনে, যেন চড় মেরে গেল বাংলাদেশকে। আমরা কেউ তা বুঝি না....

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরেও দৈনিক পত্রিকায় ঠিক এমন একটি ছবি বেরিয়েছিল। মুখঢাকা এক কিশোরীর। সে ছবি দেখেও অনেকে কেঁদেছিল। পাকি কর্তৃক ধর্ষিত বিধ্বস্ত বাংলাদেশের ছবি। কোন অমিল নেই ছবি দু'টির।...."

অমিল না থাকার কারণ তখন ছিল পাকি ও তাদের সহযোগী জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের পাকি-বাঙালীরা। তখন (২০০১-০৬) পাকিরা না থাকলেও ছিল তাদের সহযোগীদের উত্তরসূরিরা, যাদের সমষ্টিগত নাম বিএনপি-জামায়াতে ইসলামী ঐক্যজোট প্রভৃতি। পাকিরা ইসলামের নামে ৩০ লাখ হত্যা ও ১০ লাখ ধর্ষণ করেছিল। ২০০১-০৬ সালে পাকি-বাঙালীরা ঐ পরিমাণ না হলেও খুন-ধর্ষণ কম করেনি, যার একজন ছিল ১৩ বছরের হিন্দু বালিকা পূর্ণিমা শীল। তারাই এ বিএনপি-জামায়াত- জাতীয় পার্টি সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' করেছিল। এবং ইসলামের নামে বিসমিল্লাহ বলে আওয়ামী লীগ, অসাম্প্রদায়িক মানুষ আর সংখ্যালঘুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বিধর্মী বলে। পূর্ণিমার কী ঘটেছিল এবং কী হয়েছিল তা আপনাদের জানা দরকার।

সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার বড়হড় ইউনিয়নের পূর্ব দেলুয়া গ্রামের অনীল শীল তাঁর স্ত্রী ও কন্যা পূর্ণিমাকে নিয়ে বাস করতেন। তাঁর ছিল একটা সেলুন। নিহায়ত গরিব পরিবার। ৮ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টায় খালেদা-নিজামী-আমিনীর অনুগতরা জোটের জয়ের আনন্দ উপভোগ করতে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী পূর্ণিমাকে তুলে নিয়ে যায়। তখন গ্রামগঞ্জে খালেদার বাহিনী এ কাজ করছে। ভোলায় একটি গ্রামের ৭০টি মেয়েকে নিয়ে তাণ্ডব করেছিল এ মুসলমানরা। আমাদের বাংলাদেশের সুশীল সমাজের মুসলমানরাও তখন ভেবেছিলেন হিন্দুরা হচ্ছে গনিমতের মাল। কয়েকদিন পর যখন মুসলমান মেয়েদেরও তুলে নিতে লাগল তখন সুশীল মুসলমানরা শঙ্কিতবোধ করেছিলেন।

যাক, ঘটনাটি এবং এ ঘটনাগুলো সংবাদপত্র ও মিডিয়া তখন প্রায় ব্ল্যাকআউট করে দিয়েছিল। সিরাজগঞ্জের ইত্তেফাকের প্রতিবেদক আমিনুল ইসলাম যিনি যুক্ত ছিলেন নির্মূল কমিটির সঙ্গে তখন এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট করেন এবং শাহরিয়ারকে জানান। ইত্তেফাক রিপোর্টটি ছেপেছিল ১৬ অক্টোবর। শাহরিয়ারের নেতৃত্বে নির্মূল কমিটির দল চলে যায় উল্লাপাড়া পূর্ণিমাদের বাসায়। সেখানে সরেজমিনে তারা সব দেখে। অবস্থা তখন খুবই প্রতিকূল। নির্মূল কমিটির পক্ষ থেকে পশুরূপী মানুষদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত হয়। পূর্ণিমার পরিবার এতে সম্মতি জানায়। এ লড়াইয়ে তাদের ওপর আবারও জুলুম হতে পারে, এ কথা জানানো হলে পূর্ণিমার মা জানান, আমাদের তো সব গেছে আর কী যাবে? শাহরিয়ার তখন পূর্ণিমাকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। অবস্থা

কেমন ছিল তার একটি উদাহরণ দিই। ফেরার ঠিক আগের মুহূর্তে শাহরিয়ার জানতে পারেন যে, পরিবারটি তিন দিন ধরে উপোস আছে। তখন সবার কাছে যা ছিল তার পুরোটা পরিবারটিকে দিয়ে আসেন।

বাসায় ফেরার পর শাহরিয়ারের মেয়ে যার বয়স তখন পূর্ণিমার থেকে খানিকটা বেশি— সে জানায় যে, বিএনপির মানুষজন বিসমিল্লাহ বলে যা করেছে তা বলার নয়। মেয়েটির শরীরের বিভিন্ন অংশ তারা খুবলে নিয়েছে।

নির্মূল কমিটির উদ্যোগে পরের দিন প্রেস কনফারেন্স হয়। এক পর্যায়ে চোখে হাতচাপা দিয়ে পূর্ণিমা কেঁদে ফেলে। সে ছবিটিই ছেপেছিল সংবাদ, জনকণ্ঠ। ঐদিন বিদেশী সাংবাদিকরাও দেখেছিল রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের নামে এবং বিসমিল্লাহ বলে খালেদা অনুসারীরা কী করেছিল, অনেকে চোখের পানি ধরে রাখতে পারেনি। পরের দিন সারা দেশ তো বটে, বিদেশীরাও জেনে যায় দেশটিতে কী হচ্ছে? ২০০১-০৬ পর্যন্ত এ রকম অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। এখানে বলে রাখি, আজকে যাঁরা সুশীল সমাজের প্রবক্তা, গ্রামীণ ব্যাংকের দুঃখে যাঁরা কাতরাচ্ছেন তাঁদের একজনও এগিয়ে আসেননি। এসেছিলেন একজন তিনি ওয়াহিদুল হক। 'পূর্ণিমা যাত্রা নাম দিয়ে তিনি সিরাজগঞ্জ গিয়েছিলেন।

এদিকে অনীল চন্দ্র ১০ অক্টোবর উল্লাপাড়া থানায় মামলা করেছিলেন ১৭ জনকে আসামি করে। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশ মামলা নেয়নি। ২৪ অক্টোবর পূর্ণিমা নিজে বাদী হয়ে নারী ও শিশুনির্যাতন আইনে মামলা করে। আদালতের আদেশে পূর্ণিমার মেডিক্যাল পরীক্ষা করার পর ধর্ষণের ভয়ঙ্কর চিত্র ফুটে ওঠে। তদন্ত শেষে ২০০২ সালের ৯ এপ্রিল আদালতে ১৭ জনকে অভিযুক্ত করে চার্জশীট দেয়া হয়।

ঐ এলাকার এমপি ছিলেন তখন বিসমিল্লাহর ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের সমর্থক পাকি-বাঙালী আলী আকবর। তাঁর ওপর মহান দায়িত্ব বর্তেছিল তখন ইসলাম রক্ষা করার। তিনি বিসমিল্লাহ বলে কাজে নামলেন। তৎকালীন ঐ এলাকার ওসি শেখ শহীদুল্লাহ (বর্তমান আইজিকে অনুরোধ করব তার নামটি মনে রাখার এবং এ লোকটি কোথায় আছে তা খোঁজ করার) অধিকতর তদন্ত করে ইসলামের নামে যারা ধর্ষণ করেছিল সেই ১৭ জনকে বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগের এমপি আবদুল লতিফ মীর্জা (প্রয়াত), পৌর মেয়র থেকে শুরু করে যারা পূর্ণিমার ঘটনার রিপোর্ট করেছিল তাদের আসামি করে। পূর্ণিমার বাবা নারাজি দেন। এদিকে আসামিদের জামিন দেয়া হয়। ২০০৭ সালে মামলা মূলধারায় ফিরে আসে। কিন্তু ইতোমধ্যে ৬ আসামি পালিয়ে যায়।

আলী আকবর নামে পাকি-বাঙালীই তখন পূর্ণিমার মাকে গিয়ে বলে, ২০ হাজার টাকা দিচ্ছি, বলতে হবে শাহরিয়ার কবিররা এর সঙ্গে জড়িত। পূর্ণিমার মা বলেছিলেন, পূর্ণিমা শাহরিয়ারকে বাবা বলে। বাবার বিরুদ্ধে ২০ লাখ টাকা দিলেও সে কিছু বলবে না। আকবর আলীরা তখন খুবই হেনস্থা করেছিল পূর্ণিমাদের সমর্থকদের। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এদের পরিবারের

মেয়েদেরও কেউ এমনভাবে নির্যাতন করলে তারা অখুশি হবে না। পূর্ণিমা কিছুদিন শাহরিয়ারের বাসায় ছিল, তারপর ওয়াহিদুল হকের মেয়ের বাসায়, পরে তাকে স্কুলে ভর্তি করে হোস্টেলে রাখা হয়।

নির্মূল কমিটির সদস্যরা তখন পূর্ণিমার প্রাথমিক খরচ চালিয়েছে। এরপর ওয়াহিদুল হক। কতদিন তিনি পরামর্শ করেছেন আমার সঙ্গে কিভাবে পূর্ণিমার খরচ চালানো যায়। তিনি নিজেও ছিলেন প্রায় নিঃস্ব। পূর্ণিমাকে কঠিন অভিভাবকত্বে রাখা হয়েছিল। এখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। পড়ার খরচ বহন করতে পারছে না। তার পড়ার খরচ দু'বছর বহন করেছিল ফ্রিডম ফাউন্ডেশন এবং এরপর অধ্যাপক অজয় রায়ের মানবাধিকার সংগঠন। এরই মধ্যে পূর্ণিমার বাবা মারা গেছেন। খালেদা-নিজামীর দোজখী শাসনের অবসান হয়েছে এবং অবশেষে পূর্ণিমার মামলার রায় বেরিয়েছে ৪ মে। বিচারক ওসমান হায়দার ন্যায্য বিচার করেছেন। আসামি ১১ জনকে (৬ জনকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানার টাকা পূর্ণিমাকে প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলি, ভোলার যে ৭০ জনকে ধর্ষণ করা হয়েছিল তারা দেশ ত্যাগ করেছিল। সুশীল সমাজ তখন চাপা হাসি হেসেছিল ইসলাম রক্ষা হলো বলে। আমি যে ভাষ্যের কথা বলেছিলাম শুরুতে তার শেষটি উল্লেখ করছি— "তবে এতটুকু বুঝেছি, আল্লাহ বলেন, ভগবান বলেন, গড বলেন, তাতে বিশ্বাস রাখেন কী-না রাখেন, মানুষের চোখের জলের একটি অভিশাপ আছে। আওয়ামী লীগ যদি মানুষের চোখের জলের (২০০১) কারণে চলে গিয়ে থাকে তাহলে আজ যারা আছে তারাও ঐ পথে যাবে। পূর্ণিমার ছবিটি আপনি ছুড়ে ফেলে দিতে পারেন, তারপর কন্যাকে আদর করে স্ত্রীকে নিয়ে পার্টিতে যেতে পারেন, কিন্তু আপনাকে আমাকে একটি কাফ্ফারা দিতে হবে। কারণ, আমরা অনেক কথা বলেছি, যা রাখিনি। শপথ করে কথা না রাখলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। (সুরা মায়িদা)। এরপর আমার আপনার স্ত্রীকে যখন অপহরণ করা হবে, কন্যাটিকে তুলে নেয়া হবে, বোনটিকে গায়েব করে দেয়া হবে, তখন বুঝবেন পূর্ণিমা আসলে কি বলতে চেয়েছিল!"

কাফফারা কি দেয়নি খালেদা-নিজামীরা বা গণধর্ষকরা? কিন্তু এরা এমনই জিনিস, জিনিস এ কারণে বলছি যে মানবসন্তানদের একটি বোধ থাকে, এদের মধ্যে সেটির নিদারুণ অভাব।

হাইকোর্টে রিট করার ফলে আদালত আদেশ দিয়েছিল ২০০১-০৬ সালে যে নারকীয় নির্যাতন করা হয়েছে বলে তা তদন্ত করে একটি রিপোর্ট দেয়ার জন্য। জনাব সাহাবুদ্দীনের নেতৃত্বে একটি কমিশন করা হয় এবং তিনি ১০০০ পাতার একটি রিপোর্ট দেন। যা ঘটেছে তার সামান্য অংশমাত্র তাঁরা তুলে ধরেছিলেন। বিএনপি-সন্তানরা বলতে থাকে, এটি সঠিক নয়। এর পরপরই পূর্ণিমার রায় প্রকাশিত হলো। পূর্ণিমার মামলার আইনজীবী আবদুল হামিদ যা বলেছেন তার সঙ্গে আমরা একমত— "২০০১ সালের নির্বাচনের পর বিএনপি-জামায়াত জোট

দেশব্যাপী সংখ্যালঘুদের ওপর যে নির্যাতন চালিয়েছিল এ রায়ের মধ্য দিয়ে তা প্রমাণিত হলো।" (জনকণ্ঠ, ৫-৫-১১)।

আমি পূর্ণিমা ও তার পরিবারটিকে শ্রদ্ধা জানাই। এতটুকু একটি মেয়ে পুরো একটা দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল তার অপমানের প্রতিবিধান করতে। ভাবা যায়? যে দেশে কেউ নিজেকে ছাড়া সাহায্য করে না এবং মামলায় জিতে সে প্রমাণ করল, নিজে দাঁড়াতে চাইলে সমাজের কেউ না কেউ সাহায্য করবে। পুরো সমাজটা অমানবিক হয়ে যায়নি। পূর্ণিমা ১৯৭১ সালের মুক্তিযোদ্ধাদের মতো একটি প্রতীক। এ মেয়েটি সুশীলদের, আমাদের চড় মেরে বুঝিয়ে দিল আমরা মানুষ নই। কারণ আমরা নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছি, আমরা ধর্ষিতাকে রক্ষা করিনি, ধর্ষকদের বিচার থেকে অব্যাহতি দিতে চেয়েছি এবং এর প্রবল প্রতিবাদ করিনি। পরিবারটিকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসিনি।

এখন আবার রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও বিসমিল্লাহ রাখার জন্য চিৎকার শুরু হয়েছে। যার বাসা থেকে মদের বোতল পাওয়া গিয়েছিল সেই মওদুদ ইসলাম রক্ষার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। 'বিসমিল্লাহ' রেখে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' রাখার পর বাংলাদেশ দোজখে পরিণত করা হয় সেটি কি ভাল? যদি সংবিধানে তাই হয়, সংখ্যালঘুরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হবেন। গয়েশ্বর রায়, নিতাই রায়, মির্জা ফখরুল, মওদুদ বা খালেদা জিয়া-আমিনী ক্ষমতায় এলে তারা আবার [পূর্ব অভিজ্ঞতা বলে] ইসলামের নাম করে মেয়েদের, আওয়ামী লীগারদের গণিমতের মাল মনে করবে। বুঝে দেখুন, বঙ্গবন্ধু যে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছিলেন সেটি ভাল না জিয়াউর রহমানের 'বিসমিল্লাহ' এবং এরশাদের 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' ভাল?

সবশেষে দু'টি কথা বলব। একদিকে যেমন বিচারককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি গরিবদের ওপর ন্যায়বিচার করার জন্য তেমনি আইজিকে অনুরোধ জানাচ্ছি অন্যায় করার জন্য ওসি শহীদুল্লাহকে বিচারের আওতায় আনা হোক। দায়মুক্তির সংস্কৃতির বিনাশ হোক।

পূর্ণিমা ও তার পরিবার এখন অনিরাপদ। এ মামলা আরও ১০ বছর চলবে। এরই মধ্যে আলী আকবররা বলতে পারে পূর্ণিমা নিজেই ধর্ষিত হতে চেয়েছিল। এবং এ স্বীকারোক্তি না দিলে সে আবারও ধর্ষিত হতে পারে এবং মৃত্যুও হতে পারে। জরিমানার টাকা পাওয়া দূরের কথা তার বেঁচে থাকাই কষ্টকর হয়ে উঠবে। সুতরাং এই পাকি-বাঙালীদের হাত থেকে পূর্ণিমা ও তার পরিবারকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দেয়া হোক।

সবশেষে প্রধানমন্ত্রী বরাবর একটা দরখাস্ত

গত দু'বছর অসংখ্য মানুষজন এসে আমাদের কাছে ধর্ণা দেয় তারা নিঃস্ব হয়ে গেছে, চিকিৎসা পর্যন্ত করাতে পারছে না ২০০১-০৬ সালের নির্যাতনের কারণে। তাদের অপরাধ ছিল তারা আওয়ামী লীগ সমর্থন করেছিল অথবা খালেদা-নিজামীর সমর্থক ছিল না। এই তো কয়েকদিন আগে নাটোরে জনকণ্ঠ প্রতিনিধি

এসে আমাকে জানালেন দুলুর লোকজন তাঁকে কিভাবে প্রায় মেরে ফেলেছিল। এখন তিনি নিঃস্ব, চিকিৎসা খরচ চালাতে পারছেন না। আপনার এমপিদের আপনি যেমন জানেন, আমরাও কম জানি না। তাঁরা এখন অন্য ধান্দায় ব্যস্ত। এই নির্যাতিত লোকগুলোর আপনি ছাড়া কেউ নেই। ২০০১-০৬ সালে আমি দেখেছি আপনি কিভাবে এদের সাহায্য করেছেন। দলের এখন নৈতিক কর্তব্য একটি তহবিল গড়ে তোলা [এমপি ও আওয়ামী লীগ সমর্থক ব্যবসায়ীদের টাকাই তার জন্য যথেষ্ট] যা থেকে এদের সাহায্য দেয়া যাবে। এরা আপনাকে যেভাবে ভালবাসেন আপনার নেতা বা মন্ত্রীরা মতলব ছাড়া ভালবাসেন কিনা জানি না। এদের দিকে একটু দেখুন। এরাই আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবে। আমরা নই। এবং পূর্ণিমার পড়াশোনার ব্যবস্থাটা রাষ্ট্র থেকে দেয়ার বন্দোবস্ত করে দিন। সে যেন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, আমাকে দেখ, বাংলাদেশে খালেদার অধিকার যতটুকু আমার অধিকারও ততটুকু। আমি এ দেশেই থাকব এবং মাথা উঁচু করে থাকব। সে আমাদের মনে করিয়ে দেবে খালেদারা বিসমিল্লাহ বলে, নিজামী-আমিনী-এরশাদরা রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করে কী করেছিল।

জনকণ্ঠ, ৯ মে ২০১১

৭ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করা হয় নির্মূল কমিটির সহ-সভাপতি অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ময়মনসিংহের সিনেমা হলে বোমা হামলা। পরদিন ৮ ডিসেম্বর তাঁকে সিএমএম কোর্টে হাজির করা হলে জামিন নামঞ্জুর করা হয়। ৫ জানুয়ারি ২০০৩ তারিখে হাইকোর্টে আপীল করার পর তাঁর শুধু জামিনই মঞ্জুর করা হয়নি, এই মিথ্যা ষড়যন্ত্রমূলক ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপ্রসূত মামলা থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেয়া হয়। তিনি ৮ই জানুয়ারি দিনাজপুর জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন ঃ শ্বেতপত্রের ভূমিকা*

শাহরিয়ার কবির

২০০১ সালের ১ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের উপর যে নজিরবিহীন নির্যাতন আরম্ভ হয়েছিল ১৫০০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তা বন্ধ হয়নি। এর কারণ ক্ষমতাসীন চার দলীয় জোটের রাজনৈতিক লক্ষ্যের ভেতর অনুসন্ধান করতে হবে।

জোটের শরিক হচ্ছে বিএনপি, জামাতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট ও জাতীয় পার্টির একাংশ। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের প্রধান স্থপতি, স্বাধীন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান অসাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন।** ক্ষমতায় এসে তিনি ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদ খারিজ করে 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদের নামে এক ধরনের ইসলামী জাতীয়তাবাদ প্রচলন করেছিলেন। '৭২-এর সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল সেটি বাতিল করে তিনি জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ প্রভৃতি ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল পুনর্গঠনের সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন, যা ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী ও অসাংবিধানিক।

---

* ২০০৫-এর অক্টোবরে তিন খণ্ডে প্রকাশিত শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র শ্বেতপত্রের ভূমিকা

** ২৯ আগস্ট ২০০৫ তারিখে বাংলাদেশের হাই কোর্ট '৭৫-এর ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর থেকে ১৯৭৯-এর ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত খন্দকার মোশতাক, বিচারপতি সায়েম ও জেনারেল জিয়াউর রহমানের ক্ষমতাগ্রহণ এবং তাদের সরকারকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক বলেছে। বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ও এটিএম ফজলে কবির সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ এই যুগান্তকারী রায় ঘোষণা করেছে। হাইকোর্টের এই রায়ের ফলে সংবিধানের ৫ম সংশোধনী— এমনকি ৮ম সংশোধনীও কার্যত বাতিল হয়ে যায়। সরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে স্থগিতাদেশ লাভ করেছে। এতে আবারও প্রমাণিত হয়েছে বর্তমান সরকার অবৈধ ও অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতাদখলের পক্ষে এবং ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালিত্বের চেতনার বিপক্ষে।

জামাতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট স্বঘোষিত ধর্মীয় মৌলবাদী দল। এদের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে কোরাণ ও সুন্নাহভিত্তিক ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম করা, যে ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে জিম্মি হিসেবে গণ্য করা হয়। জামাতীরা '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষার দোহাই দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে গণহত্যা ও নারীনির্যাতনসহ যাবতীয় ধ্বংসযজ্ঞে মদদ জুগিয়েছে এবং নিজেরাও উদ্যোগী হয়ে রাজাকার, আলবদর, আলশামস প্রভৃতি ঘাতক বাহিনী গঠন করে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ করেছে।

জেনারেল জিয়ার মতো জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল এরশাদও সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছিলেন। জেনারেল জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গিয়ে জেনারেল এরশাদ সংবিধানের ইসলামীকরণ আরও সংহত করেছেন ৮ম সংশোধনীর দ্বারা ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' ঘোষণার মাধ্যমে।

২০০১ সালের অক্টোবরে যে জোট সরকার বাংলাদেশে ক্ষমতায় এসেছে তারা ইসলামপন্থী। বিএনপি নিজেদের জামাতে ইসলামী বা ইসলামী ঐক্যজোটের মতো ইসলামপন্থী দল না বললেও তাদের রাজনৈতিক দর্শন হচ্ছে মুসলিম লীগের মতো ইসলামী জাতীয়তাবাদ। জোটের অপর দুই প্রধান শরিক জামাতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট বাংলাদেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবার ঘোষণা দিয়েই ক্ষমতায় এসেছে। বিএনপির মতো জাতীয় পার্টিও রাজনৈতিক ইসলামে বিশ্বাসী। রাজনৈতিক ইসলামের ভেতর গণতন্ত্র বা উদারনৈতিকতার কোন স্থান নেই। জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবুল আলা মওদুদী গণতন্ত্রকে কুফরি মতবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। জামাত ও তাদের সহযোগীরা মানবরচিত কোন সংবিধান অনুমোদন করে না। এ ধরনের সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী দলগুলো যখন জোট বেঁধে ক্ষমতায় যায় তখন এটাই স্বাভাবিক যে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সমাজ গঠনের প্রতি তারা মনোযোগী হবে এবং এর জন্য যা কিছু করা দরকার যে কোন মূল্যে তারা তা করবে।

জোট সরকার ক্ষমতায় এলে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের মনোভাব কী হবে তার পরিচয় আমরা তত্ত্বধায়ক সরকারের আমলেই পেয়েছি। ২০০১-এর ১৩ জুলাই শেখ হাসিনার সরকার সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রক্ষমতা বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট অর্পণ করে। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিএনপি-জামাতের নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোটকে কীভাবে ক্ষমতায় আনতে চেয়েছে এ বিষয়ে বহু প্রতিবেদন ও কলাম বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। ২০০১-এর মধ্য জুলাই থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চার দলীয় জোটের স্থানীয় কর্মী ও সমর্থকরা সুপরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়— বিশেষভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা, নির্যাতন, ভীতি প্রদর্শন এমনকি হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত আরম্ভ করে। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুরা যাতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে না যায় এবং

কেউ যদি যায় তারা যেন চার দলীয় জোটের প্রার্থী ছাড়া অন্য কাউকে ভোট না দেয়।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে এবং এটাই স্বাভাবিক। পৃথিবীর সব দেশেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সাধারণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোকেই সমর্থন করে। আওয়ামী লীগ ছাড়াও এদেশের হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ও আদিবাসীরা নির্বাচনে অন্যান্য বামপন্থী ও প্রগতিশীল দলের প্রার্থীদেরও ভোট দেয়। বিভাগপূর্ব বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির অধিকাংশ সদস্য ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায় থেকে আগত। তবে বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটাররা বিএনপি ও জাতীয় পার্টিকেও যে ভোট দেয় তার নজিরও রয়েছে। যেহেতু সাধারণভাবে মনে করা হয় হিন্দুমাত্রেই আওয়ামী লীগ সমর্থক সেজন্য আওয়ামী লীগের ভোট কমানোর উদ্দেশ্যেই নির্বাচনের সময় তাদের উপর হামলা হয়। এই সব প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কী ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে, আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে তাদের কী পরিণতি হবে— এসব খবর ২০০১ সালের মধ্য জুলাই থেকেই জাতীয় দৈনিকসমূহে স্থানলাভ করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রধানতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংখ্যালঘু নির্যাতন আরম্ভ হলেও পরবর্তীকালে তা বহুমাত্রিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। গত ১৫০০ দিনের ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এই নির্যাতনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে তালেবান শাসিত আফগানিস্তানের মতো একটি মনোলিথিক মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করা।

কোন দেশে গৃহযুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ছাড়া ১৫০০ দিন ধরে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিঃসন্দেহে ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিক ঘটনা। বাংলাদেশে জোট সরকার যদি মনে করত এই নির্যাতন চলতে দেওয়া উচিৎ নয় তাহলে প্রথম থেকেই তারা তা বন্ধ করতে পারত। নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনৈতিক সহিংসতা আমাদের মতো দেশে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সংসদে দুই তৃতীয়াংশের বেশি আসন যে সরকারের রয়েছে তারা সংখ্যালঘু নির্যাতনের মতো বর্বরোচিত পন্থা অবলম্বন না করেও তাদের ঘোষিত ও অঘোষিত এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে তা হয়নি। জোট সরকার সংখ্যালঘু নির্যাতন অব্যাহত রাখবার জন্য প্রথম থেকেই নির্যাতনের ঘটনা অস্বীকার করেছে। সরকারের এই অস্বীকৃতির কারণে স্থানীয় প্রশাসন নির্যাতকদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, এমনকি বহু ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ পর্যন্ত থানায় গ্রহণ করা হয়নি।

এই নির্যাতনের ঘটনা শুধু বাংলাদেশের সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়নি। বিশ্বের বহু দেশের সংবাদপত্রে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদনে, জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবেদনে, মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট, বৃটিশ হোম অফিস সহ পশ্চিমের বহু দেশের সরকারী প্রতিবেদনে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা বলা হয়েছে। অথচ সরকার সব সময় নির্যাতনের ঘটনা গোপন করতে চেয়েছে, বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত এতদসংক্রান্ত

সংবাদকে 'ভিত্তিহীন,' 'বানোয়াট', ও 'অতিরঞ্জিত' এবং 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলেছে।*

সরকারকে তুষ্ট করবার জন্য পুলিশ প্রশাসন কখনও নির্যাতিতদের বলতে বাধ্য করেছে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা কোথাও ঘটেনি; তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সরকারকে বিব্রত করবার জন্য এসব প্রচার করছে ইত্যাদি। এ বিষয়ে সরকারের কোন বক্তব্যই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। সরকারের অস্বীকৃতি ছিল প্রকৃতপক্ষে নির্যাতকদের জন্য সবুজ সংকেত। নির্যাতনকারীরা জানে সরকার তাদের পক্ষে, সে কারণে তারা অধিকতর নির্যাতনে উৎসাহী হয়েছে। এভাবেই ২০০১ সালের মধ্য জুলাই থেকে চার বছরের অধিককাল অব্যাহত রয়েছে সংখ্যালঘু নির্যাতন।

দুই

১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়ও আমরা লক্ষ্য করেছি ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বিভিন্ন জায়গায় হয়রানি, হামলা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনের পর আমরা নির্বাচনকেন্দ্রিক সংখ্যালঘু নির্যাতনের উপর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছিলাম। এর ভূমিকায় বলা হয়েছিল— '১২ জুন '৯৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সাধারণভাবে অবাধ এবং সুষ্ঠু হয়েছে। শতকরা ৭৩ ভাগ ভোটার এই নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে, যা বিগত অতীতে কখনও দেখা যায়নি। নির্বাচনের এই ইতিবাচক সত্যটির পাশাপাশি আরেকটি দুর্ভাগ্যজনক ও মর্মান্তিক সত্য হচ্ছে— নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর হামলা, তাদের ভয়ভীতি প্রদর্শন কিংবা শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে ভোটকেন্দ্রে যেতে না দেয়ার যে সব ঘটনা সারা দেশে ঘটেছে তারও কোনও নজির আমাদের ইতিহাসে নেই।

'পাঁচ বছরের দুঃশাসনে সীমাহীন দুর্নীতি এবং স্বৈরাচারী নিষ্পেষণের কারণে বিএনপি যতটা অজনপ্রিয় হয়েছিল, নির্বাচনের আগেই বোঝা গিয়েছিল যে তাদের ভরাডুবি ঘটবে। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের দ্বারা সূচিত একাত্তরের ঘাতক দালালদের দল মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনের কারণে এটাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবারের নির্বাচনে জামাতেরও ভরাডুবি ঘটবে। গত ১ জুন (১৯৯৬) 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্রের' নেতৃবৃন্দ ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন, 'নির্বাচন যদি অবাধ ও সুষ্ঠু হয় ... আগামী সংসদে একাত্তরের ঘাতক দালাল ও যুদ্ধাপরাধী একজন ব্যক্তিও নির্বাচিত হয়ে আসতে পারবে না।'

'নির্বাচনের পূর্বে আমাদের পর্যবেক্ষণ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবারের নির্বাচনে বিএনপি ৬০/৭০টির বেশি আসনে জয়ী হতে পারবে না।

* ডেইলি স্টার, ১৬ অক্টোবর ২০০১।

জামাত যে একটি আসনেও জয়ী হতে পারবে না এ কথাও পূর্বে ব্যক্ত হয়েছে। তারপরও নির্বাচনে বিএনপি ১১৬টি এবং জামাত ৩টি আসনে জয়ী হয়েছে। এই জয়ের জন্য নির্বাচনের ৮ দিন আগে বিএনপি ও জামাত যৌথভাবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার ভেতর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বিরত রাখা।

'জামাত ও বিএনপি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এ কাজটি সম্পাদন করেছে। প্রধানত সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকায় তারা নির্বাচনের পূর্বে ব্যাপক ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং নানা ধরনের হুমকি প্রদান করে। ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে, নির্বাচনের দিন তাদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দিয়ে, কেন্দ্র থেকে বলপূর্বক বের করে দিয়ে, শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে সাত লক্ষেরও বেশি ভোটারকে তারা ভোট দিতে দেয়নি। এই সাত লক্ষের প্রায় সকলেই আওয়ামী লীগের সমর্থক। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় ১২ জুনের নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের বিবরণ প্রকাশিত হলেও সরেজমিন তদন্তের সময় দেখা গিয়েছে প্রকৃত ঘটনা অনেক বেশি ভয়াবহ। ৮টি মানবাধিকার সংস্থা উপদ্রুত একটি নির্বাচনী এলাকার (চাঁদপুর-১) সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের যে বিবরণ ১৫ জুনের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ করেছে তা থেকে ঘটনার ভয়াবহতা কিছুটা আঁচ করা যাবে।

'সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক অপপ্রচারের সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে পিরোজপুর-১ নির্বাচনী এলাকায়। এই এলাকার বিএনপি ও জামাতে ইসলামীর যৌথ সাম্প্রদায়িক প্রচারণা এবং সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সাংসদ সুধাংশু শেখর হালদার, যিনি '৯১-এর নির্বাচনে ১৭ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়ী হয়েছিলেন।'*

১৯৯৬-এর অভিজ্ঞতা থেকে আমরা ২০০১ সালে বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলাম, সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় নির্বাচনের দিন যাতে নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে যেতে এবং ভোট দিতে পারে তা নিশ্চিত করবার জন্য যা কিছু করা দরকার সে সব যেন করা হয়। বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকে প্রশাসনের শীর্ষপদে এমন সব রদবদল করেছে যা তাদের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ করবার পাশাপাশি আওয়ামী লীগের প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব স্পষ্ট করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই আমি লিখেছিলাম—'ছিয়ানব্বইয়ে আমরা দেখেছি নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক প্রচারণা, ধর্মের নামে ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং সাম্প্রদায়িক নির্যাতন; যার ফলে সাত থেকে আট লক্ষ হিন্দু ভোটার ভোট কেন্দ্রে যেতে পারেনি বা গেলেও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে।

* 'জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯৬ : সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের শ্বেতপত্র', সম্পাদনা : শাহরিয়ার কবির, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, আগস্ট ১৯৯৬।

'ছিয়ানব্বইয়ের নির্বাচনে সার্ক-এর পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে আমি নিজে চাঁদপুরের একটি নির্বাচনী এলাকায় গিয়েছিলাম, যেখানে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের কারণে ছয়টি কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছিল, সাতদিন পর যেখানে পুনর্নির্বাচন হয়েছে। এলাকায় গিয়ে দেখেছি কয়েক হাজার হিন্দু ভোটার নির্যাতন ও ভয়ভীতির কারণে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা পুনর্নির্বাচনের দিন ভোট দিতে যাবেন না। সার্কের প্রতিনিধি দলে পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাংবাদিক খালিদ মাহমুদ ও ভারতের বরেণ্য কথাশিল্পী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও ছিলেন। তাঁরা ভোটারদের বলেছেন, আপনারা নির্ভয়ে ভোট দিতে যাবেন, উপদ্রুত এলাকায় পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে, প্রয়োজন হলে আর্মি ক্যাম্প বসানো হবে এবং নির্বাচনের দিন তাঁরাও উপস্থিত থাকবেন। আক্রান্ত ও ভীতসন্ত্রস্ত ভোটাররা জবাব দিয়েছেন, আপনারা একদিন উপস্থিত থাকবেন, পুলিশ ক্যাম্প থাকবে এক সপ্তাহ, বড়জোর এক মাস, তার পর কী হবে? ওরা আবার আমাদের মারধর করবে, মেয়েদের বেইজ্জত করবে। বলা বাহুল্য ১৯ জুন পুনর্নির্বাচনের দিন সেই এলাকায় হিন্দু ভোটাররা ভোট দিতে যাননি এবং তাঁরা যে প্রার্থীকে সমর্থন করতেন তিনি সামান্য ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন। গত নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে দাবি করা সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি নির্বাচনী এলাকায় সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, যার বিরুদ্ধে সরকার ও প্রশাসন কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

'ছিয়ানব্বইয়ের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা এবার বেশি ঘটবে। কারণ গতবার সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তি আলাদাভাবে নির্বাচন করেছিল, এবার তারা খালেদা জিয়া ও এরশাদের সঙ্গে জোট বেঁধেছে, অতীতের তুলনায় অনেক বেশি সহিংস হয়েছে। বাংলাদেশে চল্লিশটিরও বেশি নির্বাচনী এলাকায় হিন্দু ভোটাররাই নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণ করে। স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক পরিবেশে একজন হিন্দু ভোটার যদি বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামাতে ইসলামী বা ইসলামী ঐক্যজোটের প্রার্থীকে ভোট দিতে চান বা তাদের প্রার্থী হতে চান কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু তাদের যদি ভয়ভীতি দেখিয়ে ভোটকেন্দ্রে যেতে দেয়া না হয়, তাহলে গোটা নির্বাচনই প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। নির্বাচনের আগে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন নানা ধরনের হয়। কখনো বলা হয় নির্দিষ্ট দলের প্রার্থী জয়ী হলে হিন্দুদের দেশছাড়া করা হবে। কখনো হিন্দুদের উপর অত্যাচারের অজুহাত হিসেবে বলা হয় ভারত থেকে হিন্দুরা এসে ভোট দেয়ার জন্য অমুক অমুক বাড়িতে বা গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। গতবার বৃহত্তর রাজশাহীতে আওয়ামী লীগের ভরাডুবির এটা ছিল বড় কারণ। রাজশাহীর হিন্দু ভোটাররা যারা বরাবর নৌকায় ভোট দিতেন, তারা বলেছেন সেবার সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে অর্ধেক ভোট নৌকায় দিয়েছেন, অর্ধেক দিয়েছেন ধানের শীষে, যাতে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের সমর্থক হওয়ার অপরাধে তাদের দেশছাড়া হতে না হয়।

'বিচারপতি লতিফুর রহমানের সরকারকে অবাধ, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন ও গণতন্ত্রের স্বার্থে নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক প্রচারণা বন্ধ করতে হবে, যারা তা অমান্য

করবে তাদের প্রার্থী হিসেবে অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে। আসন্ন নির্বাচনে যদি ধর্ম, বিত্ত, লিঙ্গ ও জাতিসত্তা নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা না যায় তাহলে কোনও অবস্থায় এ নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ বলা যাবে না।

'এবারের নির্বাচনের জন্য আরেকটি বিস্ফোরন্মুখ ক্ষেত্র হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতিসত্তার প্রতিনিধিরা ভোটার তালিকা সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন। জনসংহতির নেতা সন্তু লারমা দাবি জানিয়েছিলেন উপদেষ্টা পরিষদে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের প্রতিনিধি রাখবার জন্য। বাংলাদেশে চল্লিশের বেশি সংখ্যালঘু জাতিসত্তা রয়েছে। চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর উপর অবৈধ বাঙালি অভিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। নির্বাচনের আগে নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে বাংলাদেশের এক দশমাংশ এলাকায় নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হবে। নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে এসব বিষয়ে এখনই মনোযোগ দিতে হবে।'*

এ বিষয়ে শুধু 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' নয়, 'হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদ', 'সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন', 'আইন ও সালিস কেন্দ্র', 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ' ও 'প্রিপ ট্রাস্ট' সহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন সভা, সমাবেশ, সংবাদ সম্মেলন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে স্মারকপত্র প্রদানের মাধ্যমে আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন বন্ধের এবং নির্বাচনের সময় তাদের নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছে। বলা বাহুল্য এসব আবেদন নিবেদনের প্রতি বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেনি।

'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গণবিরোধী সাম্প্রদায়িক চরিত্র সেপ্টেম্বরের ভেতর অনেকের চোখেই ধরা পড়েছিল। এ বিষয়ে তখন আমাদের পর্যবেক্ষণ ছিল— 'গত আড়াই মাসের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সার সংকলন করলে এটাই প্রতীয়মান হবে— তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কাজ হচ্ছে মৌলবাদী তালেবানি সন্ত্রাসীদের তত্ত্বাবধান করা, যে কোন মূল্যে চার দলীয় জোটের ক্ষমতায় যাওয়ার পথ সুগম করা। এ ক্ষেত্রে তাদের সর্বশেষ পদক্ষেপ হচ্ছে পরিস্থিতি অনুকূল না হলে 'মিডিয়া ক্যু' করা। এ কারণেই সরকার বিটিভি ছাড়া অন্য কোন চ্যানেলকে সরাসরি নির্বাচনের ফলাফলের খবর পরিবেশন করতে দেবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টারা ও নির্বাচন কমিশন বলেছেন, নির্বাচন কতটুকু অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় তা তদারক করার জন্য বিশাল এক পর্যবেক্ষক গোষ্ঠীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে এদের ভেতর জামাত ও বিএনপির অনুসারী হচ্ছে শতকরা আশি ভাগ। জামাতে

* জনকণ্ঠ, ২৩ জুলাই ২০০১।

ইসলামী কর্তৃক পরিচালিত ইসলামিক ব্যাংককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে নির্বাচন পরিচালনার। নড়াইলে জনকণ্ঠের যে তরুণ সাংবাদিক ইসলামী ঐক্যজোটের প্রার্থী মুফতি সহিদুল ইসলামের তালেবান কানেকশন সম্পর্কে লিখেছিলেন তাঁকে তালেবান সন্ত্রাসীরা এলাকাছাড়া করেছে। এই সাংবাদিক থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলেন, তাঁর অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি। প্রাণ বাঁচাবার জন্য জনকণ্ঠের নড়াইল সংবাদদাতা খুলনায় আশ্রয় নিয়েছেন।

'আমরা ভেবেছিলাম বিচারপতি লতিফুর রহমান তাঁর পূর্বসূরি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ ও বিচারপতি হাবিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মোটামুটি সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করবেন। তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন সেই সব ব্যক্তি যাঁরা গত জুনে ঢাকায় আয়োজন করেছিলেন 'মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় সম্মেলন', যেখানে যোগ দিয়েছিলেন দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচটি দেশের সিভিল সমাজের নেতৃবৃন্দ। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী শুধু বাংলাদেশের নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে এবং বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে নির্বাচন কিভাবে শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ করা যায় সে বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে পরামর্শ দেয়া। বিচারপতি লতিফুর রহমান একাত্তরের চিহ্নিত ঘাতক, দালাল, যুদ্ধাপরাধী, রাজাকারদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত দেখা করলেও গত আড়াই মাসে আমাদের সঙ্গে তাঁর দেখা করার সময় হয়নি। রাজাকারদের সঙ্গে দেখা করার যুক্তি হিসেবে তিনি অবশ্য বলেছেন কারা রাজাকার আর স্বাধীনতাবিরোধী তিনি জানেন না, তালেবানদের নেটওয়ার্ক সম্পর্কেও তিনি কিছু জানেন না। এসব কথা বলে তিনি একদিকে প্রশাসন এবং অপরদিকে জামাত-শিবির আর তালেবানদের যে সবুজ সংকেত পাঠিয়েছেন তার মাশুল দিচ্ছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় ও গ্রামাঞ্চলের নারীরা।

'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অভিযাত্রা' কর্মসূচীর অধীনে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ সারা দেশের ৪২টি নির্বাচনী এলাকায় ব্যাপক গণসংযোগ, প্রচার, ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মশালা পরিচালনা, থানা পর্যায়ে জনসভা প্রভৃতির আয়োজন করেছেন। এই ৪২টি নির্বাচনী এলাকার ৩০টি আসনে জামাত, ৭টি আসনে ইসলামী ঐক্যজোট আর ৫টি আসনে বিএনপির যুদ্ধাপরাধী, মৌলবাদী ও রাজাকাররা প্রার্থী হয়েছে। এসব এলাকা সফর করে আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে আগামী নির্বাচন আদৌ অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হবে না।

'একাত্তরের ঘাতক দালাল যুদ্ধাপরাধী ও মৌলবাদীদের দল জামাতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট চিরকাল রাজনীতি করেছে ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে, সরল ও ধর্মপ্রাণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। ঐক্যজোটের প্রার্থীরা বলছেন তাদের

ভোট দিলে আর হজ্বে যেতে হবে না, তাঁদের ভোট দেয়াটা হচ্ছে হজ্ব করার সামিল। জামাতীরা বলছে যারা তাদের ভোট দেবে তারা বেহেশতে যাবে, যারা দেবে না তারা দোজখে যাবে। দেলোয়ার হোসেন সাঈদী ফতোয়া দিয়েছেন—এবারের নির্বাচন হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের লড়াই, হিন্দুকে ভোট দিলে নামাজ ও জানাজা হবে না। তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বিএনপির প্রার্থীরাও বলছেন এবারের নির্বাচন হচ্ছে 'ধুতি আর টুপির লড়াই।' নারী ও সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বলা হচ্ছে নির্বাচনের দিন তারা ভোট কেন্দ্রে যেতে পারবে না। গেলে নারীদের বেইজ্জত করা হবে, গায়ের কাপড় খুলে নেয়া হবে আর হিন্দুদের দেশছাড়া করা হবে। বিভিন্ন এলাকায় হিন্দুদের বিরাট অংকের চাঁদা দিতে বাধ্য করা হচ্ছে।

'প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘোরার সময় যখন আমাদের কাছে এ ধরনের অভিযোগ এসেছে আমরা জানতে চেয়েছি তাঁরা থানায় অভিযোগ করেছেন কিনা। অধিকাংশের উত্তর হচ্ছে থানায় গেলে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা হয় না, উপরন্তু সন্ত্রাসীরা জানতে পারলে নির্যাতনের মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। অনেকে বলেছেন, তাঁরা থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলেন, থানা তাঁদের অভিযোগ গ্রহণ করেনি। সাতক্ষীরার এক হিন্দু ব্যবসায়ী তাঁর পানের বরজ বিক্রি করে মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের চাঁদার দাবি মিটিয়েছেন। প্রাণভয়ে তিনি থানায় যাননি, সন্ত্রাসীদের নামও আমাদের বলেননি। এ ধরনের অনেক সংবাদ দৈনিক পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয় না। কোন কোন হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থাপন্ন হিন্দুরা বাড়ির মেয়েদের ভারতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা নিদারুণ আতঙ্কে ভয়াবহ ভবিষ্যতের দিন গুণছেন।

'বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একনিষ্ঠ রাজাকার ও তালেবানপ্রেম যেহেতু স্থানীয় প্রশাসনের অজানা নয়, যেহেতু তারা বুঝে ফেলেছে এই সরকার মূলত চার দলীয় জোটের সরকার, যৌক্তিক কারণেই চার দলীয় জোটের জন্য বিব্রতকর এমন কোন পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়।

'গত সপ্তাহে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের নেতৃবৃন্দ ইউরোপ ও আমেরিকার কূটনীতিকদের সঙ্গে এক নৈশভোজে মিলিত হয়েছিলেন। আমাদের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে নির্বাচনের দিন শহরাঞ্চলের ভোটকেন্দ্রেগুলোর পরিস্থিতি মোটামুটি স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ থাকবে, কারণ সেখানে দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষকরা থাকবেন, সামরিক বাহিনী ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা থাকবেন। মৌলবাদীরা যে কৌশলটি গত নির্বাচনের সময় কয়েকটি এলাকায় নিয়েছিল এবার তা ব্যাপকভাবে নেবে। সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যরা এবং গ্রামের নারীরা যাতে ভোটকেন্দ্রে যেতে না পারে এবার সে পরিস্থিতি তারা সৃষ্টি করবে। পরিস্থিতি সম্পর্কে বিদেশী কূটনীতিকরাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অথচ চার দলীয় জোটের নেত্রী ও নেতারা বলছেন হিন্দুদের উপর কোন অত্যাচার হচ্ছে না আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলছে কোন অত্যাচার হলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

'সামরিক বাহিনী বিভিন্ন এলাকায় টহল দেয়া শুরু করেছে। সন্ত্রস্ত গ্রামবাসী জানে সামরিক বাহিনী নির্বাচনের পর থাকবে না, থাকবে সাঈদী, আমিনী আর নিজামীদের বাহিনী। মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা না হলে এবারের নির্বাচনে অন্ততপক্ষে পঁচিশ লাখ হিন্দু ভোটার ভোট দিতে পারবেন না। মৌলবাদীদের ফতোয়া ও হুমকির কারণে গ্রামের সাধারণ মানুষ বাড়ির বৌ-ঝিদের বলছে কাজ নেই ভোট দিতে গিয়ে। এ সম্পর্কে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঢাকায় বসে শুধু ফরমান জারি করছে, গ্রামে গ্রামে গিয়ে বিপন্ন সন্ত্রস্ত জনগোষ্ঠীকে আশ্বস্ত করার মতো কোন উদ্যোগ নেয়নি। অবশ্য নেয়ার কথাও নয়, কারণ তারা এবারের সংসদে স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার ও যুদ্ধাপরাধীদের আগমনের সকল পথ ইতিমধ্যেই সুগম করে দিয়েছেন।'*

অন্য সব ক্ষেত্রে আমাদের পর্যবেক্ষণ পরে সঠিক প্রমাণিত হলেও সামরিক বাহিনী সম্পর্কে আমাদের ধারণা সঠিক ছিল না। সামরিক বাহিনী নির্বাচনের দুদিন আগে পর্যন্ত নিরপেক্ষতার ভান করেছে। নির্বাচনের একদিন আগে সন্ত্রাস দমনের নামে বিভিন্ন জায়গায় তারা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও এলাকাছাড়া করেছে এবং নির্বাচনের দিন সরাসরি চার দলীয় জোটের পক্ষে কাজ করেছে।

২০০১ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে এবং নির্বাচন যে কোন অবস্থায় অবাধ ও সুষ্ঠু হবে না—এ বিষয়ে সংবাপত্র ও সিভিল সমাজ সচেতন থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলো সে ধরনের সতর্কতা প্রদর্শন এবং প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সংগঠিত করেনি। যার ফলে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের উপর যে নির্যাতন আরম্ভ হয়েছে তার জের এখনও চলছে।

তিন

২০০১ সালের ১ অক্টোবর থেকে জাতীয় দৈনিকসমূহে বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর যে বহুমাত্রিক নির্যাতনের সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে তা আমাদের প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ ও উদ্বিগ্ন করলেও সরকারের প্রতিক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার আরও নয় দিন ক্ষমতায় ছিল। ১০ অক্টোবর বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট ক্ষমতাগ্রহণ করে। লতিফুর রহমান যেমন প্রথম থেকে অস্বীকার করেছেন কোথাও কোন সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেনি একইভাবে জোট সরকারও ক্ষমতাগ্রহণের পর থেকে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা অস্বীকার করেছে।

---

* জনকণ্ঠ, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০১।

জোট সরকারের শরিক ও মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তির মুখপত্র দৈনিক 'ইনকিলাব', 'সংগ্রাম' ও 'দিনকাল' ছাড়া দেশের গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক পত্রিকাগুলোতে ধারাবাহিকভাবে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার খবর প্রকাশিত হয়েছে। 'ডেইলি স্টার', 'প্রথম আলো', 'যুগান্তর', 'ইত্তেফাক' প্রভৃতি দৈনিক আওয়ামী লীগ সমর্থক মনে করবার কোন কারণ নেই। এসব পত্রিকায় কোন কোন জোটপন্থী বাম কলাম লিখিয়ে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা যা ছাপা হচ্ছে তা অতিরঞ্জিত এবং এসব জোট সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্টকরণ চক্রান্তের অন্তর্গত বলে মন্তব্য করেছেন। ৪ অক্টোবর (২০০১) 'মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন'-এর পক্ষ থেকে নির্বাচনকালীন সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সম্পর্কে উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে একটি বিবৃতি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছিল। এর তিন দিন পর যুগান্তর-এ বাম ও সেক্যুলার দাবিদার কলাম লিখিয়ে ফরহাদ মজহার বিবৃতিদাতাদের প্রতি বিষোদগার করে এক বিরাট কলাম ফেঁদেছিলেন।

জোট সরকারের উচ্ছিষ্টভোগীদের মতো আমাদের কিছু তথাকথিত বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মনে করেন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। নির্বাচনের সময় কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে, হিন্দুদের উপর কোথাও কোথাও যে নির্যাতন হয়েছে তার কারণ রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক নয়। এদের কেউ কেউ মনে করেন অমুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদায়কে 'সংখ্যালঘু' হিসেবে আখ্যায়িত করা প্রতিক্রিয়াশীলতা। এদের কেউ বর্তমান নির্যাতনকে যৌক্তিক প্রমাণ করবার জন্য এমনও লিখেছেন এ ধরনের নির্যাতন অতীতে আওয়ামী লীগ আমলেও হয়েছে। তারা এমন কথাও বলেছেন প্রতিবেশী ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর যত নির্যাতন হয় বাংলাদেশে সে তুলনায় কিছুই হয়নি। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙার অজুহাতে বাংলাদেশে কয়েক সপ্তাহ ধরে হিন্দুদের উপর যখন নৃশংস নির্যাতন চালানো হয়েছিল, কয়েক হাজার মন্দির, ঘর-বাড়ি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয়েছিল তখনও কোন কোন সেক্যুলার দাবিদার বুদ্ধিজীবী বলেছিলেন ভারতের তুলনায় বাংলাদেশে কিছু হয়নি। '৯২-এর সাম্প্রদায়িক সহিংসতার উপর লেখা তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা' উপন্যাস সম্পর্কে তারা বলেছেন ভারতের বিজেপির স্বার্থ রক্ষার জন্য নাকি এ বই লেখা হয়েছে!

ফরহাদ মজহার ও বদরুদ্দীন উমরের মতো বুদ্ধিজীবীরা যখন মৌলবাদের উত্থান ও সাম্প্রদায়িক নির্যাতন সম্পর্কিত লেখালেখির ভেতর প্রতিক্রিয়াশীলতা আবিষ্কার করেন তখন এটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা কেন এত নির্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করে।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাঁর প্রথম বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছিলেন, 'এদেশের মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টানসহ সকল ধর্মের, সকল আদিবাসী প্রতিটি মানুষই বাংলাদেশী। এই ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশে যারা সংখ্যালঘু শব্দটি ব্যবহার করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমাদের মাঝে বিভক্তির দেয়াল তুলতে চায় তাদের বিষয়ে দেশবাসীকে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি।'[*]

প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের জবাব আমরা পরদিনই দিয়েছিলাম একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সংবাদ সম্মেলনে, যেখানে উপস্থিত ছিল গণধর্ষিতা কিশোরী পূর্ণিমা ও তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ। আমরা বলেছিলাম, 'বাংলাদেশে কেউ সংখ্যালঘু পরিচয়ের বিড়ম্বনা নিয়ে থাকুক এটা আমরা কেউ চাই না। বাংলাদেশে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সবাই জাতিগত পরিচয়ে বাঙালি এবং নাগরিকত্বের পরিচয়ে বাংলাদেশী। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান কিংবা আদিবাসী কেউ সংখ্যালঘু পরিচয় নিয়ে বাংলাদেশে বাস করতে চান না। দুর্ভাগ্যের বিষয় রাষ্ট্র তাদের কপালে সংখ্যালঘুত্বের ছাপ এমনভাবে এঁকে দিয়েছে যে সেটা সহজে মুছে ফেলা যাবে না। প্রথমে সংবিধান থেকে ৫ম সংশোধনীর দ্বারা ধর্মনিরপেক্ষতা খারিজ করে মুখবন্ধে 'বিসমিল্লাহ ....' সংযোজন করে, তারপর ৮ম সংশোধনীর দ্বারা রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণার মাধ্যমে অমুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদায় ও জাতিসত্তাসমূহকে এটা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে তারা এদেশে 'সংখ্যালঘু' এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। সংখ্যায় লঘু বলেই হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপর ইচ্ছামত হামলা ও নির্যাতন করা যায়। বিশেষ করে হিন্দুদের উপর হামলার অজুহাত হিসেবে দাঁড় করানো হয় তারা আওয়ামী লীগের সমর্থক, যদিও নির্বাচনে হিন্দুরা বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও অন্যান্য দলকেও ভোট দেয়। সংখ্যালঘু হওয়ার কারণেই তারা পরিণত হয়েছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে— আক্রান্ত হলেও যাদের প্রতিবাদ জানাবার সাহস নেই।'[**]

তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী প্রথমে বিবিসির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে পরে উপদ্রুত একটি এলাকায় জনসভায় এবং তারপর বিএনপির মহাসচিব ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, 'পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক নির্যাতন সম্পর্কে অতিরঞ্জিত সংবাদ ছাপা হচ্ছে। পত্রিকায় যা ছাপা হয়েছে তার ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ অসত্য ও ভিত্তিহীন, কারণ পত্রিকার সংবাদের সঙ্গে জেলা প্রশাসকদের পাঠানো রিপোর্টের কোন মিল নেই।'[***]

সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য শীর্ষ মন্ত্রীরা যখন বলেন পত্রিকার খবর অসত্য ও ভিত্তিহীন তখন কি কোন জেলা প্রশাসকের পক্ষে সম্ভব তাঁদের মিথ্যেবাদী বলা? সরকারের নীতি নির্ধারকরা কী চান এটা জেলা প্রশাসন বুঝে ফেলেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে। সরকারের নীতি নির্ধারকদের অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ না করলে কী শাস্তি ভোগ করতে হয় তা-ও

---

[*] জনকণ্ঠ, ২০ অক্টোবর ২০০১।

[**] সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণ শ্বেতপত্রের দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে দেখুন।

[***] জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০১।

জেলা প্রশাসন জানে। সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের পাঠানো রিপোর্টের সঙ্গে পত্রিকার সংবাদের কোন মিল না থাকা স্বাভাবিক।

যে সব মানবাধিকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপদ্রুত এলাকা সফর করেছেন তারা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, বাস্তবে সংখ্যালঘু নির্যাতনের যত ঘটনা ঘটেছে পত্রিকায় তার অর্ধেকও ছাপা হয়নি। কারণ—

১) নির্যাতকরা প্রধানতঃ ক্ষমতাসীন বিএনপি ও জামাতে ইসলামীর কর্মী ও সমর্থক হওয়ায় নির্যাতিতরা থানায় অভিযোগ জানাতে ভয় পেয়েছে অধিকতর নির্যাতনের আশঙ্কায়। নির্যাতিতরা মানবাধিকার সংগঠন কিংবা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতেও ভয় পেয়েছে একই আশঙ্কার কারণে।

২) দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জানা সম্ভব নয়।

৩) ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে নির্যাতিতরা কদাচিৎ থানায় অভিযোগ করে, অধিকতর নির্যাতনের আশঙ্কার পাশাপাশি সামাজিক রক্ষণশীলতার কারণে। বাংলাদেশসহ এশিয়ার বহু দেশে ধর্ষণকারীর চেয়ে ধর্ষিতা নারীকে সমাজে অবাঞ্ছিত ও ঘৃণ্য বিবেচনা করা হয়।

৪) এবার যেহেতু প্রথম থেকেই সরকার সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা অস্বীকার করছিল, থানাও সেই কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভুক্তভোগীদের অভিযোগ রেকর্ড করার বিষয়টি বহু ক্ষেত্রে সচেতনভাবে উপেক্ষা বা প্রত্যাখ্যান করেছে। বহু ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে হয়রানি ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। কোথাও তাদের উল্টো মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

৫) নির্বাচনকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার হাজার হাজার হিন্দু পরিবার সহায়-সম্পদ-সম্ভ্রম-আপনজন হারিয়ে কাউকে কিছু না বলে প্রাণ রক্ষার জন্য ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, যাদের সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানবার কোন উপায় নেই।

৬) যারা ভারতে গিয়েছে তাদের অনেকের সঙ্গে বিবিসির প্রতিনিধি ও আমি কথা বলেছি। সেখানকার বৈরি রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে অনেকেই স্বীকার করতে চায় না যে তারা ২০০১-এর অক্টোবরের পর দেশত্যাগ করেছে এবং

৭) যারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোন অবস্থায় মাতৃভূমি ত্যাগ করবে না তারা নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ করে তাদের অবস্থান বিপদসঙ্কুল করতে চায়নি। প্রতিবেশীরা জানলেও এসব ঘটনা কোন পত্রিকায় ছাপা হয়নি।

এসব কারণে এবারের নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত পরিসংখ্যান কখনও জানা যাবে না।

সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদন থেকে এবারের সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের যে সব নৃশংস ঘটনা জানা গেছে— একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ছাড়া বাংলাদেশে অতীতে কখনও এরকম ঘটেনি। তবে একাত্তরে

নির্যাতনের জন্য দায়ী ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, যারা ছিল বহিরাগত। এবারের ঘটনা একটি ক্ষেত্রে একাত্তরের চেয়েও ভয়াবহ, কারণ নির্যাতনকারীরা বহিরাগত শত্রুদেশের সৈন্য নয়, তারা বাঙালি এবং নির্যাতিতদের প্রতিবেশী কিংবা একই গ্রামের মানুষ। একাত্তরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যারা প্রাণে বাঁচার জন্য দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল তারা আবার ফেরত এসেছে। এবার যারা সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার হয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেছে, যাদের সঙ্গে বিবিসি প্রতিনিধি বা আমার কথা হয়েছে, তারা জানিয়েছে যে, তাদের কেউ দেশে ফিরবে না।

২০০১ সালের মধ্য জুলাইয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে যে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সূচনা ঘটেছে, নির্বাচনের পর তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম তিন মাস এমন একটি দিন পাওয়া যাবে না যেদিন দেশের কোথাও না কোথাও সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেনি। এবারের সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ধরন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে হত্যার চেয়ে শারীরিক নির্যাতন, লুণ্ঠন, গৃহে অগ্নিসংযোগ, বলপূর্বক চাঁদা আদায় ও ধর্ষণের ঘটনা বেশি ঘটেছে। ধর্ষণের ক্ষেত্রে ছয় বছরের শিশু থেকে ষাট বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত হামলাকারীদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। বিভিন্ন জায়গায় ধর্ষিতাকে আরও লাঞ্ছিত করবার জন্য ধর্ষকরা তাদের বিবস্ত্র করে প্রকাশ্য জনপদে ঘুরিয়ে চরম পাশবিকতার পরিচয় দিয়েছে। হত্যা করা হয়েছে সদ্যজাত শিশু থেকে আরম্ভ করে পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত। হত্যার কবল থেকে মন্দিরের পুরোহিত, বৌদ্ধ ভিক্ষু, বর্ষীয়ান জ্ঞানতাপস পর্যন্ত রেহাই পাননি, যাঁদের পক্ষে কারও অনিষ্ট করা কল্পনারও অতীত বিষয়। কোথাও হিন্দুকে বলপূর্বক মুসলমান জানানো হয়েছে। আবার কোন মুসলমান অথবা আদিবাসী স্বেচ্ছায় খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলে তাদের নির্যাতন— এমনকি হত্যাও করা হয়েছে।

বিভিন্ন পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সংবাদ যখন প্রাত্যহিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে, যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও মানবাধিকার সংস্থা উপদ্রুত এলাকাসমূহ ঘুরে এসে দেশবাসীর সামনে নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে সরকারের কাছে প্রতিকার চেয়েছে, সরকার কোন ব্যবস্থা নেয়নি। 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র' নামের একটি মানবাধিকার সংগঠন সরকারের নির্লিপ্ততায় ক্ষুব্ধ হয়ে উচ্চতর আদালতে মামলা পর্যন্ত করেছিল। আদালত সরকারের কাছে এ বিষয়ে কৈফিয়ৎ তলব করেছে। প্রায় চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও সরকার কোন কৈফিয়ৎ দেয়নি। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব নির্বাচনের পর দুবার ঢাকায় এসে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সরকারের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ কখনও বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। ২০০১ সালের ডিসেম্বরে এ্যামনেস্টির মহাসচিবকে

প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের অভিযোগ তদন্ত করবার জন্য একটি কমিশন গঠন করা হবে। এতদিনেও সেই কমিশন গঠিত হয়নি।

এবারের সুপরিকল্পিত ও ধারাবাহিক সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ও সমাজবিজ্ঞানীরা একে এক ধরনের 'এথনিক ক্লিনজিং' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। নির্বাচনের আড়াই মাস আগে থেকেই গ্রাম এলাকায় বিএনপি-জামাতের দলীয় সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে বলেছে—বাংলাদেশে কোন হিন্দু থাকতে পারবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্যাতনের পর হিন্দুদের ভারতে চলে যেতে বলা হয়েছে। বিএনপি ও জামাতে ইসলামীর মত দলগুলো ধরে নিয়েছে অমুসলিম মাত্রেই আওয়ামী লীগের সমর্থক এবং আওয়ামী লীগের প্রতি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন। বিএনপি-জামাতের বিবেচনায় নির্যাতনের কারণে অমুসলিমরা দেশ ছেড়ে চলে গেলে— ১) আওয়ামী লীগের ভোট কমবে এবং ২) বাংলাদেশকে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মতো মনোলিথিক মুসলিম রাষ্ট্র বানানো সহজ হবে।

আমরা বিভিন্ন উপদ্রুত এলাকা ঘুরে দেখেছি দলীয় পরিচয় নির্বিশেষে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আক্রমণের শিকার হয়েছে। চট্টগ্রামের বর্ষীয়ান শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরিকে জামাতে ইসলামীর ঘাতকরা হত্যা করেছে, যিনি ছিলেন ওয়ার্কার্স পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য। চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাথেরো, ভিক্ষু দুলাল বড়ুয়া ও হিন্দু পুরোহিত মদনমোহন গোস্বামীকে হত্যা করা হয়েছে, যাদের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। সিরাজগঞ্জের গণধর্ষিতা বালিকা পূর্ণিমার মা বাসনারাণী বলেছেন তারা বিএনপিকে ভোট দিয়েছেন বলেও নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাননি। সুতরাং এরকম ধারণা করা উচিৎ হবে না যে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের সমর্থক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নির্যাতনের শিকার হয়েছে। রাজনৈতিক কারণ অবশ্যই রয়েছে। জোট সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা গত চার বছর ধরে নির্যাতিত হচ্ছেন। কিন্তু হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের কারণ মূলতঃ সাম্প্রদায়িক, যার সঙ্গে সম্পর্কিত বাংলাদেশের বহুত্ববাদী সমাজকে মনোলিথিক ইসলামভিত্তিক সমাজে পরিণত করবার মৌলবাদী প্রয়াস।

চার

নির্বাচনের আগে ও পরে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন উপদ্রুত এলাকা ঘুরে এসে সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে যে সব তথ্য সংবাদ সম্মেলন করে দেশবাসীকে জানিয়েছে সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের সঙ্গে কোন অমিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। সংখ্যালঘু নির্যাতনের 'অতিরঞ্জিত' 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' সংবাদ প্রকাশের জন্য সরকার দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রকে যেভাবে অভিযুক্ত ও হয়রানি করেছে

একইভাবে ক্ষিপ্ত হয়েছে মানবাধিকার রক্ষকদের প্রতি। যে সব সামাজিক ও মানবাধিকার সংগঠন/এনজিও নির্বাচনের আগে থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা, সমান অধিকার ও মর্যাদার জন্য কাজ করছিল খালেদা জিয়ার সরকার ক্ষমতায় এসে তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের ৪২ দিন পরই আমাকে গ্রেফতার করেছিল। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে— নির্বাচনের পর সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের যে সব মানুষ নিজেদের মাতৃভূমি ত্যাগ করে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা'র অপরাধ করেছি, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে বিবিসিকে সাক্ষাৎকার দিয়ে সরকার ও দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছি। আমাকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়ে কী ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়েছে তার বিবরণ দু মাস পর জামিনে জেল থেকে বেরিয়ে সংবাদ সম্মেলনে দিয়েছি।

এক বছর পর আমাকে আবার গ্রেফতার করা হয় ২০০২ সালের ডিসেম্বরে। সেবার আমার সঙ্গে বিবিসির দুজন বিদেশী সাংবাদিক সহ অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, সাংবাদিক সেলিম সামাদ, সাংবাদিক এনামুল হক ও মানবাধিকার কর্মী প্রিসিলা রাজকেও গ্রেফতার করে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চালিয়েছে। এরপর দেশের অন্যতম বৃহৎ এনজিও প্রশিকার সভাপতি ডঃ কাজী ফারুখ আহমেদ সহ তাঁর প্রতিষ্ঠানের ১৫২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের কত হাজার নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে সম্ভবত দলের নেতারাও তা জানেন না। আওয়ামী লীগের উপর সরকারী নির্যাতনের বিষয়টি এই শ্বেতপত্রে আলোচনায় আনতে চাই না, কারণ আমাদের বিষয় হচ্ছে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন।

নির্যাতনের কথা লিখতে গিয়ে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শতাধিক সাংবাদিক সরকারী দল ও প্রশাসন কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের হয়রানি, গ্রেফতার ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। খুলনায় মাণিক সাহা ও বগুড়ায় দীপঙ্কর চক্রবর্তীর মতো সাংবাদিকদের এবং অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদের মতো লেখককে হত্যা করা হয়েছে প্রধানত সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন সম্পর্কে লেখালেখির জন্য। অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদ তাঁর 'পাক সার জমিন' উপন্যাসে সংখ্যালঘু নির্যাতনের সঙ্গে মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পৃক্তির কথা বলেছেন। এতে জামাতীরা এতই ক্ষিপ্ত হয়েছিল যে সংসদে দাঁড়িয়ে তাঁকে শায়েস্তা করবার জন্য ব্লাশফেমি আইন চালু করবার দাবি জানিয়েছিলেন জামাতের সাংসদ দেলোয়ার হোসেন সাঈদী। ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে সাঈদীর নির্বাচনী এলাকায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর কী নৃশংস নির্যাতন চালানো হয়েছে তার বহু বিবরণ জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত হয়েছে।

২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকেন্দ্রিক নির্বাচনোত্তর সংখ্যালঘু নির্যাতন পরিমাণ ও ভয়াবহতার বিচারে অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক

বেশি হলেও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যেমন কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। নির্যাতক যেহেতু জোট সরকারের শরিকদের স্থানীয় সন্ত্রাসীরা সেক্ষেত্রে সরকার ও প্রশাসন নির্যাতন বন্ধের জন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এটা আশা করা যায় না। অতীতে আমরা দেখেছি এ ধরনের নির্যাতন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো যেভাবে একজোট হয়ে এগিয়ে এসেছে এবার সে ধরনের কিছু আমরা দেখিনি। আওয়ামী লীগ, জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি, সিপিবি ও সমমনা কিছু দলের নেতারা বিচ্ছিন্নভাবে উপদ্রুত কিছু এলাকা সফর করেছেন এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে নির্যাতিতদের কিছু সাহায্যও করেছেন, কিন্তু নির্যাতন বন্ধের ক্ষেত্রে তাঁরা একজোট হয়ে কিছু করেননি যেমনটি সীমিত পরিমাণে '৯২-এর ডিসেম্বরেও করেছিলেন।

আওয়ামী লীগের সমর্থক কোন কোন কলাম লেখক এমনটি লিখেছেন যে নির্বাচনের পর এই দলটির উপর যে ভয়ঙ্কর ও অপ্রত্যাশিত আঘাত এসেছিল তাতে নিজেদের রক্ষা করাই দুঃসাধ্য ছিল, নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের পাশে সেভাবে দাঁড়ানো সম্ভব ছিল না। আমাদের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে সরকারী জুলুম-পীড়ন-হত্যা-গ্রেফতার উপেক্ষা করে আওয়ামী লীগের যে সব নেতা এলাকায় ছিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন সেসব এলাকায় কম হয়েছে। সেই সব অঞ্চলে নির্যাতন বেশি হয়েছে— আওয়ামী লীগের নেতারা নির্বাচনের পর যেখান থেকে চলে এসেছেন। উপদ্রুত বহু এলাকার নির্যাতিতরা এই মর্মে অভিযোগ করেছেন যে দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের কোন নেতা তাদের পাশে এসে দাঁড়াননি। আওয়ামী লীগ ছাড়া মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর শক্তি এমনই সীমিত যে তাদের পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু করা সম্ভব নয়। এদের ভেতর কিছু এমন দলও আছে যারা আওয়ামী লীগের প্রতি বিদ্বেষবশত নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ায়নি। তারা ক্ষমতাসীন জোটের মতো হিসেব করেছে— নির্যাতনের কারণে হিন্দুরা দেশত্যাগ করলে আওয়ামী লীগের ভোট কমবে।

প্রয়োজন ছিল নজিরবিহীন এই মানবিক বিপর্যয় প্রতিহত করবার জন্য আওয়ামী লীগ সহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সকল রাজনৈতিক দলের ইস্পাতদৃঢ় ঐক্য এবং কার্যকর প্রতিরোধ কর্মসূচী। কিন্তু কিছু বাম দলের ভেতর আওয়ামী লীগ বিদ্বেষ এমনই প্রবল যে মানবতার এই চরম দুর্যোগও তাদের বিচলিত করেনি— পাছে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট বাঁধতে হয়! অথচ '৯২-সালের ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগসহ ১১টি বাম দল 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কমিটি' গঠন করে উপদ্রুত এলাকায় গিয়েছিল, নির্যাতিতরা কিছু পরিমাণে হলেও সাহস ও সান্ত্বনা লাভ করেছে, নির্যাতকরা ভয় পেয়েছে, নির্যাতন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এবার সংখ্যালঘু নির্যাতন দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার প্রথম কারণ যদি হয় জোট সরকারের প্রতিহিংসা ও সাম্প্রদায়িক জিঘাংসা, দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিরোধহীনতা।

রাজনৈতিক দলগুলো কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলে জনসাধারণের পক্ষে নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে আসা সম্ভব হয় না। কিছু ক্ষেত্রে জনগণের স্বতস্ফূর্ত প্রতিরোধ আমরা দেখেছি। এর পাশাপাশি এটাও দেখেছি বিপদগ্রস্ত হিন্দু প্রতিবেশীকে আশ্রয় দিয়ে মুসলমান প্রতিবেশী কীভাবে আক্রান্ত হয়েছে।

গত চার বছরে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-মানবাধিকার সংগঠনগুলোর ভেতর সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন এবং নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল— ১) একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ২) মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্র, ৩) মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন, ৪) বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ, ৫) সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন, ৬) বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ৭) আইন ও সালিস কেন্দ্র, ৮) বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ৯) হট লাইন বাংলাদেশ, ১০) হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটিয, ১১) সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, ১২) সিটিজেনস ভয়েস প্রভৃতি। এ ছাড়া 'প্রশিকা', 'গ্রিপ ট্রাস্ট', 'নারী প্রগতি সংঘ' ও 'নিজেরা করি' সহ কয়েকটি এনজিও এ ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল এবং এর জন্য কিছু প্রতিষ্ঠানকে চড়া মাশুলও দিতে হয়েছে।

৬ নবেম্বর ২০০১ তারিখে দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবী ও মানবাধিকার কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি'। সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ও কারণ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরবার জন্য এই কমিটি একটি গণতদন্ত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০০১-এর ডিসেম্বর মাসে অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীকে সভাপতি করে তিন সদস্যবিশিষ্ট গণতদন্ত কমিশন গঠিত হয়। এর অন্য সদস্যরা ছিলেন ব্যারিস্টার শফিক আহমদ ও এডভোকেট তবারক হোসেইন। নাগরিক কমিটি ও তদন্ত কমিশনের সদস্যবৃন্দ বেশ কয়েকটি উপদ্রুত অঞ্চল সফর করেছেন। গণতদন্ত কমিশন সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে তাদের শতাধিক পৃষ্ঠার প্রতিবেদন প্রকাশ করে ২০০২ সালের ২৬ এপ্রিল।

১৪-১৩ ফেব্রুয়ারি (২০০২) ঢাকায় আওয়ামী লীগের পৃষ্ঠপোষকতায় সচেতন নাগরিকদের সমন্বয়ে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার কয়েক শ ভুক্তভোগী উপস্থিত ছিলেন।

২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর চলমান সংখ্যালঘু নির্যাতন ও সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব সম্পর্কে প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে 'মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন।' ৩ অক্টোবর এই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে নির্বাচনকে কেন্দ্র এর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কী ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়েছে তা তুলে ধরা হয়। এই বিবৃতি ৪ অক্টোবর ২০০১ তারিখে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সকল দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। ৯ অক্টোবর

(২০০১) 'মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন' ও 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে দেশের বরেণ্য নাগরিক ও বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এক গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে। এই আলোচনায় যে কটি প্রস্তাব গৃহীত হয় তার ভেতর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের উপর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত।

পাঁচ

আমরা '৯৬-এর নির্বাচনের পরও সংখ্যালঘু নির্যাতনের উপর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছিলাম। এবার আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল তিন মাসের নির্যাতনের তথ্য সংগ্রহ করে এই শ্বেতপত্র প্রকাশের। নবেম্বরে আমার গ্রেফতারের পর শ্বেতপত্রের তথ্য সংগ্রহের কাজ বিঘ্নিত হয়। দু মাস পর জেল থেকে বেরিয়ে জানতে পারি আওয়ামী লীগের উদ্যোগে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২০০২-এর মধ্য ফেব্রুয়ারিতে। এই কনভেনশন উপলক্ষ্যে নির্বাচনোত্তর সংখ্যালঘু নির্যাতনের দলিলও প্রকাশ করা হবে।

১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে কয়েকটি দলিল প্রকাশিত হয়। এর একটি ছিল 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধঃ ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন' এবং অপরটি 'চাদরটা সরিয়ে দাও'— শিরোনামে নির্যাতনের আলোকচিত্রিক দলিল।

সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন গণতদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ২০০২ সালের ২৬ এপ্রিল। এই প্রতিবেদনে বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে নেয়া যে তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে তার সময়কাল ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই কমিশনের প্রতিবেদন পাঠ করলে এরকম ধারণা হতে পারে যে সংখ্যালঘু নির্যাতন ছিল নির্বাচনকেন্দ্রিক, যা ডিসেম্বরের পর বন্ধ হয়েছে কিংবা কমে গিয়েছে।

আমরা বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে এবং উপদ্রুত এলাকায় গিয়ে জেনেছি সংখ্যালঘু নির্যাতন সংখ্যার হিসেবে কিছু কমলেও এলাকা আরও বিস্তৃত হয়েছে। যেসব জায়গায় নির্বাচনের পর নির্যাতন হয়নি সে সব জায়গায় ছয় মাস ও এক বছর পরও নির্যাতন হয়েছে। বিশেষভাবে ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের অধিকাংশ এলাকায় সংখ্যালঘু নির্যাতন ছড়িয়ে পড়েছে।

নির্যাতন যখন ধারাবাহিকভাবে চলছে— আমাদের শ্বেতপত্রের সময়সীমা কী হবে এ নিয়ে আমরা চিন্তিত ছিলাম। নির্যাতন আরম্ভ হয়েছে ২০০১-এর মধ্য জুলাইয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বগ্রহণের পর থেকেই। আমরা ধারণা করেছিলাম স্থানীয় সরকার নির্বাচনের পর এই নির্যাতন হয়তো বন্ধ হবে। কারণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে দেশের ভেতরে জনমত যেমন প্রবল হচ্ছিল একইভাবে আন্ত

র্জাতিক সম্প্রদায়ও এ বিষয়ে উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে সরকারের উপর নির্যাতন বন্ধ এবং নির্যাতকদের বিচার ও শাস্তি প্রদানের কথা বলেছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সংখ্যালঘু নির্যাতনের ৫০০ দিনের শ্বেতপত্র প্রকাশ করব। দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে ৫০০ নয় ১৫০০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও নির্যাতন বন্ধ হয়নি কিন্তু শ্বেতপত্রের জন্য যেহেতু একটি কালসীমা প্রয়োজন তাই আমরা ১৫০০ দিনের ভেতর আমাদের তথ্য সংগ্রহ সীমাবদ্ধ রেখেছি।

সংখ্যালঘু নির্যাতনের সংবাদ বাছাইয়ের সময় আমাদের কয়েকটি ক্ষেত্রে সতর্কতার পরিচয় দিতে হয়েছে। প্রথমত ঃ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোন আওয়ামী লীগ অধ্যুষিত অঞ্চলে যখন সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু নির্বিশেষে হামলা হয়েছে সেসব সংবাদ আমরা 'রাজনৈতিক সহিংসতা' হিসেবে বিবেচনা করে এই শ্বেতপত্রে অন্ত র্ভুক্ত করিনি। কোন এলাকায় গণডাকাতির ফলে যখন মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে আক্রান্ত হয়েছে সে সব ঘটনা আমরা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিজনিত বিবেচনা করে এই শ্বেতপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা থেকে বিরত থেকেছি। একই ভাবে সাধারণ চুরি, ছিনতাই ও মারপিটের ঘটনাও এই শ্বেতপত্রে নেই। তবে যখন কাউকে অমুসলিম হিসেবে চিহ্নিত করে মারধর করা হয়েছে, ভারতে চলে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে সেসব ঘটনা নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত।

জোট সরকার সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা কোন কোন ক্ষেত্রে স্বীকার করতে গিয়ে বলেছে এসব রাজনৈতিক সহিংসতা কিংবা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিষয়— এর ভেতর কোন সাম্প্রদায়িকতা নেই। কখনও বলেছে জোট সরকারকে বিব্রত করবার জন্য আওয়ামী লীগ সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন ও আমাকে গ্রেফতারের পর রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সময় বলা হয়েছিল বাংলাদেশে কি কোন মুসলমানের বাড়িতে ডাকাতি হয় না, সন্ত্রাসীদের হাতে কি মুসলমান নিহত হয় না, মুসলমান মেয়ে কি ধর্ষিত হয় না? গোয়েন্দা বিভাগের প্রশ্নকারীরা আমাদের যে প্রশ্ন করেছেন একই বক্তব্য জোট সরকারের তল্পিবাহক অনেক বুদ্ধিজীবী ও তথাকথিত মানবাধিকার সংগঠনেরও। তাদের বক্তব্য হচ্ছে সাধারণ অপরাধ ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে সাম্প্রদায়িক বলা উচিত নয়। কারণ তারা বিশ্বাস করেন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা নেই, সংখ্যালঘু নেই।

এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য খুব পরিস্কার। যখন কাউকে নির্যাতন করা হয় নিছক ধর্মবিশ্বাসের কারণে, যখন বিশেষ ধর্মের অনুসারী হওয়ার কারণে নির্যাতিতদের ন্যায়বিচার ও সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, যখন বিশেষ ধর্মাবলম্বী বা জাতিগত পরিচয়ের কারণে কারও দেশপ্রেমকে সন্দেহ বা কটাক্ষ করা হয় তখন তা নিঃসন্দেহে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অন্তর্গত।

এ ধরনের শ্বেতপত্রে কখনও সেইসব নির্যাতনের চিত্র পাওয়া যাবে না যা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রতিনিয়ত ভোগ করতে হয়। সুলতানা নাহার তাঁর 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়' গ্রন্থে প্রণবকুমার দেব

নামের একজন ভুক্তভোগীর জবানবন্দি অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীদের গণতদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে উদ্ধৃত হয়েছে। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের প্রাত্যহিক নির্যাতন সম্পর্কে এতে বলা হয়েছে—

১) সংখ্যালঘু হিসাবে সামাজিকভাবে হরেক রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন সংখ্যাগুরু জনগণ সব সময় তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। মানমর্যাদা ও ধন সম্পদ রক্ষা করে চলা যায় না।

২) নিজের সম্পত্তি স্বাধীনভাবে ভোগ করা যায় না। প্রতিনিয়তই সম্পদ আক্রান্ত হয়। যেমন বিনানুমতিতে পুকুর থেকে মাছ ধরে নিয়ে যাওয়া, বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কেটে নেয়া, ক্ষেতের ফসল কেটে নেয়া, শত্রু সম্পত্তির নামে ভূ-সম্পত্তি জবর দখল করা, মাস্তান ও চাঁদাবাজদের উৎপাত, পুলিশ ও ক্ষমতাসীনদের হয়রানি সংখ্যালঘুদের উপরই সর্বাধিক।

৩) স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা যায় না। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকায় আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে বেড়াতে গেলে বিডিআর-এর নির্যাতন ও স্থানীয় মুসলমানদের লুটপাটের শিকার হতে হয়।

৪) স্বাধীনভাবে স্বীয় মতামত প্রকাশ করতে পারি না। 'গ্লানি' ও 'লজ্জা' নিষিদ্ধকরণ এর দৃষ্টান্ত।

৫) স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারি না। ভয়ভীতি হুমকীর মুখে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করতে হয়, অথবা ভোট প্রদানে বিরত থাকতে হয়।

৬) সংখ্যালঘু হিসাবে নির্যাতিত হলে, সামাজিক ন্যায়বিচার পাওয়া যায় না এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো নিরাপত্তা প্রদানের পরিবর্তে হয়রানিতে অংশগ্রহণ করে থাকে।

৭) কোন সংখ্যালঘু ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে চাইলে, সমাজ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সর্বতক সাহায্য সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করে থাকে। পক্ষান্তরে কোন মুসলমান ধর্মান্তরিত হতে চাইলে সংস্থা খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে। ফলে কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতী মুসলিম সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীর প্রেমে পড়লে এবং মুসলমান যুবক-যুবতী ধর্মান্তরিত হতে ইচ্ছুক থাকলেও তা সম্ভবপর হয়ে উঠে না।

৮) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণ সংখ্যালঘুদেরকে নির্যাতিত করতে পারলে চরম আনন্দ লাভ করে। একই মামলার আসামী মুসলমানের চেয়ে হিন্দুদেরকে কয়েক গুণ বেশি নির্যাতন করা হয়। ১৯৮৬ সনের ১৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলো হতে ১৫৭ জন ছাত্রকে বিনা অপরাধে গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক জগন্নাথ হলের। তার মধ্যে আমিও একজন। পুলিশ, মুসলিম ছাত্রদের সাথে ভালো ব্যবহার করলেও আমাদেরকে "মালাউনের বাচ্চা" ও অন্যান্য অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং প্রচণ্ড মারধর করে এবং আমাদের অনেকেরই মাথা ফেটে যায় এবং পরিধেয় বস্ত্র রক্তে ভিজে যায়। ১৯৮৩ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারি গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মুসলিম ছাত্র অপেক্ষা হিন্দু ছাত্রদেরকে কয়েক গুণ বেশি দৈহিক নির্যাতন করা হয়।

৯) ট্রেনে, বাসে, লঞ্চে সংখ্যাগুরু যাত্রীগণ হিন্দু যাত্রীদেরকে (যদি বুঝতে পারে) সিট খালি থাকা সত্ত্বেও বসতে দিতে চায় না।

১০) স্বাচ্ছন্দ্যে ও নির্ভয়ে ধর্মপালন করতে পারি না।

১১) কোন কোন ক্ষেত্রে আইনের মাধ্যমেও সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। যেমন শত্রু সম্পত্তি আইন, ব্যাংক থেকে ঋণ প্রাপ্তি ও ব্যাংক থেকে জমাকৃত অর্থ উত্তোলন।

১২) রাষ্ট্রীয় আইন ও প্রশাসন সংখ্যালঘু হিসাবে আমার জানমাল ও সম্পদের কোন নিরাপত্তা দেবে না। বাবরী মসজিদ ভাঙার পর বাংলাদেশে বহু মন্দির লুট, ধ্বংস ও পোড়ানো হয়েছে, বাড়িঘর ও দোকানপাট লুট ও ভাঙচুর করা হয়েছে, অনেক হিন্দু যুবতী পৌঢ় এমনকি নাবালিকা পর্যন্ত গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। তবে একজনেরও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হতে শুনিনি। অথচ বাংলাদেশে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে কড়া আইন "সন্ত্রাসদমন" আইন বলবৎ রয়েছে।

১৩) চাকুরী বাকরীর ক্ষেত্রে ন্যায্য প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হচ্ছি। বিশেষ করে যে সব চাকুরীতে মৌখিক পরীক্ষায় যথেষ্ট নম্বর রয়েছে যে সব চাকুরীতে বৈষম্যের শিকার হচ্ছি বেশি।

১৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌখিক পরীক্ষায় তুলনামূলকভাবে কম নম্বর প্রদান করা হয়।

পেশাগত জীবনে নানান সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি

১) অন্যান্য সংখ্যাগুরু সহকর্মীদের তুলনায় অধিক কাজ চাপিয়ে দেয়া হয়।

২) সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সহকর্মীদের তুলনায় ছুটি মঞ্জুর করতে বেগ পেতে হয়।

৩) অধিক কাজ করেও এ.সি.আর.-এ অবমূল্যায়ন করা হয় যাতে ভবিষ্যতে পদোন্নতি বিঘ্নিত হয়।

৪) সংখ্যাগুরু সহকর্মীদের তুলনায় প্রতিকূল বদলির ঝামেলা বা দুর্ভোগ বেশি পোহাতে হয়।

৫) পেশাগত জীবনে পদোন্নতি পাওয়া অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না।

সংখ্যালঘু হিসাবে আমি নিরাপত্তার তীব্র অভাববোধ করি। কারণ সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর নেতিবাচক মনোভাব নিরাপত্তার প্রতি বড় হুমকি। আমার ধারণা, প্রকাশ্য রাজপথে ৮/১০ জন মুসলমান যদি আমাকে "মালাউনের বাচ্চা" বলে গালিগালাজ করে পিটাতে থাকে অথবা বাড়ি ঘরে আগুন ধরিয়ে নেয়, অথবা নারী অপহরণ/ধর্ষণ করে তবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের একটি অংশ এর নিন্দার

পরিবর্তে উৎসাহই যোগাবে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিষ্ক্রিয়ই থাকবে। ফলে আমার জানমাল, মান ইজ্জত সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর জুয়াখেলায় পরিণত হয়েছে। তদুপরি রাষ্ট্রীয় আইন, শাসক গোষ্ঠীর মনোভাব আমার প্রতিকূল। বাস্তব অভিজ্ঞতা এতো তিক্ত যে, মনে হয় সংখ্যালঘু হিসাবে বাংলাদেশে বসবাস করার চেয়ে আফ্রিকার গহীন অরণ্যে বাঘ ভালুক ও বুনো হিংস্র জানোয়ারদের সাথে বসবাস করা অধিকতর শ্রেয়। ...

বাংলাদেশের সংখ্যালঘুগণ ব্যাপক শিক্ষার হার ও অধিকার সচেতন থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বৈরী পরিবেশের কারণে অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে। নীচে এর কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো—

১। বাংলাদেশের মোট শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। সরকার ও প্রশাসন নিরপেক্ষ হলে, নিয়োগ ও পদোন্নতির অর্ধেকই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন পেত।

২। বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিশোধস্বরূপ হবিগঞ্জের মাধবপুরে স্থানীয় মুসলমানগণ, হিন্দু মন্দির ধ্বংস ও হিন্দুর বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটে মেতে উঠে। এদেরকে নিবৃত্ত করার লক্ষ্যে কর্তব্যরত ম্যাজিষ্ট্রেট গুলি করার আদেশ দিলে, দু'জন দুষ্কৃতকারী নিহত হয়। স্থানীয় মুসলমানদের আন্দোলনের চাপে এখানকার প্রশাসন নিহত দু'জনের জন্যে শহীদ মিনার নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন এবং এ.সি (ল্যান্ড)- কে বরখাস্ত করেন। উক্ত এসি (ল্যান্ড) হিন্দু ছিলেন এবং তিনি কর্তব্য ও দায়িত্ব নিয়োজিত ছিলেন না এবং অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। যে দেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ব্যাপক জনগণ, সংখ্যালঘুদের উপাসনালয়, বাড়িঘর লুট অগ্নিসংযোগ করাকে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারী ধর্ষণকে সত্যায়নের কাজ মনে করে (না হলে নিহত ব্যক্তিরা শহীদ হয় কিভাবে) সে দেশে সংখ্যালঘুরা যতোই শিক্ষিত ও অধিকার সচেতন হোক না কেন অধিকার বঞ্চিত হবেই।

৩। জাতীয় সংসদের সদস্য তোফায়েল আহমদ বরিশাল ও ভোলায় ব্যাপক হিন্দু নারী ধর্ষণ এবং এর ফলে বেশ কয়েকজন গর্ভবতী হয়ে পড়ার সংবাদ জানালে মাননীয় (?) মন্ত্রী সালাম তালুকদার রঙ্গরস করে জাতীয় সংসদের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বলেন যে, "বরিশালের মেয়েরা এতো ফার্টাইল আগে জানলে বরিশালে বিয়ে করতাম।"

৪। ১৯৯২ সনের ২৬ জুনে দহগ্রামের ৫৬টি হিন্দুবাড়ি স্থানীয় মুসলমানগণ পুড়িয়ে দেয় এবং তারা ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়। এ সংবাদ ঢাকায় পৌঁছানো সত্ত্বেও সরকারী নির্দেশে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক রিপোর্ট করা হয় যে ভারতীয় দুষ্কৃতকারীরা দহগ্রামে এসে মুসলমানদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। ...[*]

[*] সুলতানা নাহার, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, ঢাকা প্রকাশন, ১৯৯৪।

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও এখানে উল্লেখ করবার কারণ এই জবানবন্দিতে বিধৃত হয়েছে ভুক্তভোগীদের প্রতিদিনের অপমান ও মানসিক যাতনা। দেশের সংবিধান যেখানে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের সমান অধিকার ও মর্যাদা হরণ করেছে, সেখানে প্রাত্যহিক এই অপমান, বেদনা ও ক্ষোভ খুবই স্বাভাবিক। শ্বেতপত্রে নির্যাতিতদের প্রতিদিনের দুঃসহ মানসিক যাতনা অন্তর্ভুক্ত করবার সুযোগ নেই। আমরা সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা তুলে ধরতে পারি, যেখান থেকে নির্যাতনের বহুমাত্রিকতা কিছু পরিমাণে হলেও উপলব্ধি করা যাবে।

বাংলাদেশে যারা নিজেদের বাঙালি অথবা মানুষ ভাববার আগে 'মুসলমান' পরিচয়ের জন্য গর্ব অনুভব করে তাদের উদ্দেশ্যে আমরা বহুবার বলেছি, বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যারা সংখ্যালঘুদের উপর বহুমাত্রিক নির্যাতন চালাচ্ছে তারা কি একবারও ভেবে দেখে না পৃথিবীর শতাধিক দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ? যে সব দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সে সব দেশের অমুসলমানরা যদি বাংলাদেশের মডেল অনুসরণ করে সংখ্যালঘু নির্যাতন আরম্ভ করে সেক্ষেত্রে আমাদের তথাকথিত মুসলমানরা— যারা ভারত কিংবা আওয়ামী লীগ আমলের দোহাই দিয়ে চলমান সংখ্যালঘু নির্যাতনের পক্ষে সাফাই গাইতে চান তারা কী জবাব দেবেন?

ভারতে কোন হিন্দু দুষ্কৃতকারী যদি সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর হামলা করে তার জন্য বাংলাদেশের হিন্দুদের দায়ী করা অযৌক্তিক ও অমানবিক, যা বর্বরতারই নামান্তর। একইভাবে আওয়ামী লীগ আমলে কি সংখ্যালঘু নির্যাতন হয়নি এই অজুহাতে যারা জোট সরকারের আমলের সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়টি তত্ত্বগত বা শ্রেণীগত সমস্যা হিসেবে যৌক্তিক প্রমাণ করতে চান সেটাও এক ধরনের বর্বরতা।

এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে আওয়ামী লীগ আমলে সংখ্যালঘু নির্যাতন ছিল না। তখন 'অর্পিত সম্পত্তি আইন' ছিল, বর্তমান সাম্প্রদায়িক সংবিধানও ছিল। কিন্তু সেই নির্যাতনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা কতটুকু ছিল, নির্যাতনের মাত্রা ও ব্যাপকতা কতদূর ছিল সে প্রশ্নও বিবেচনায় আনতে হবে। ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ হয়ে যাবে এমনটি মনে করবারও কোন কারণ নেই।

আওয়ামী লীগ বা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি ক্ষমতায় এসে যদি '৭২-এর সংবিধানে ফিরে যায় তাহলে সংখ্যালঘুদের সমান অধিকার ও মর্যাদার অন্তত সাংবিধানিক গ্যারান্টি থাকবে, একটি ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের কাজ কিছুটা সহজ হবে। তবে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা থাকলেই যে সরকার ধর্মনিরপেক্ষ হবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই। থাকলে প্রতিবেশী ভারতে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারত না, গুজরাটের মত মুসলিমনিধনও সম্ভব হতো না। রাষ্ট্র ও

সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষ হলে নির্যাতিত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ন্যায় বিচার লাভের সুযোগ থাকে, যা বাংলাদেশে ও পাকিস্তানের মতো দেশে সম্ভব নয়।

আমরা মনে করি সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের বহুমাত্রিকতা এবং এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলোও যথেষ্ট সচেতন নয়। ১৯৯১ থেকে আমরা লক্ষ্য করছি নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগও ধর্মকে ব্যবহার করেছে, যে দলটি '৭২-এর সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি ঘোষণা করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিল। জনসভার ব্যানার ও পোস্টারের উপর 'জয় বাংলা' ও 'জয় বঙ্গবন্ধু'র মাঝখানে 'আল্লাহু আকবর' বা 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান' লিখে 'বিসমিল্লাহ----' বলে বক্তৃতা আরম্ভ করে আর যাই হোক ধর্মনিরপেক্ষ বা অসাম্প্রদায়িক হওয়া যায় না।

সাম্প্রদায়িকতা আমাদের রাষ্ট্র, রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি যেভাবে গ্রাস করেছে একইভাবে আচ্ছন্ন করেছে মনোজগৎ। ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও মানবিকতার নিরন্তর চর্চা এবং সর্বক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ব্যতিত সাম্প্রদায়িকতার মূল উৎপাটন সম্ভব নয়। আমরা মনে করি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে এই শ্বেতপত্র গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে।

ছয়

১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর আমরা নির্বাচনকেন্দ্রিক সংখ্যালঘু নির্যাতনের উপর একটি সংক্ষিপ্ত কলেবরের (৮০ পৃষ্ঠা) যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছিলাম সেখানে বিভিন্ন পত্রিকার সংবাদ, ভুক্তভোগীদের জবানবন্দি এবং আমাদের পর্যবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এবার জোট সরকারের ক্রমাগত অস্বীকৃতির কারণে আমরা প্রথমে স্থির করেছিলাম জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের সকল সংবাদ আমরা নথিবদ্ধ করব।

পরবর্তী পর্যায়ে যখন শ্বেতপত্রে তথ্য অন্তর্ভুক্তির সময়সীমা ৫০০ থেকে ১৫০০ দিনে বর্ধিত হয় তখন মনে হয়েছে এই সময়ের সকল সংবাদ গ্রন্থভুক্ত করা সম্ভব নয়। প্রথমতঃ আমাদের সীমিত সাংগঠনিক ও আর্থিক ক্ষমতা, দ্বিতীয়তঃ কম গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের ভেতর অধিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা এবং তৃতীয়তঃ ব্যবহারিক উপযোগিতা। এসব কারণে আমরা স্থির করি শ্বেতপত্রে থাকবে (১) বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংখ্যালঘু নির্যাতন সংক্রান্ত সংবাদের শিরোনাম (২) উল্লেখযোগ্য সংবাদের পূর্ণ বিবরণ, (৩) নির্যাতন সম্পর্কে দেশের বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, মানবাধিকার নেতা ও কলাম লেখকদের পর্যবেক্ষণ যা বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে, (৪) একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি সহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন, যা পত্রিকায় কিংবা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি এবং (৫) আলোকচিত্র। প্রথম খণ্ডে (দুই পর্বে) প্রকাশিত হচ্ছে ১৫ জুলাই ২০০১ থেকে ২৫ আগস্ট ২০০৫ পর্যন্ত বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংখ্যালঘু নির্যাতনের নির্বাচিত সংবাদ।

'৯৬-এর শ্বেতপত্রে আমরা সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে বিভিন্ন দৈনিকের কয়েকটি সম্পাদকীয় অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। সেই শ্বেতপত্রের সময়সীমা ছিল ৩০ দিন (৯৬-এর ১-৩০ জুন)। এবার শ্বেতপত্রের সময়সীমা বৃদ্ধি পাওয়ায় দৈনিক পত্রিকার এতদসংক্রান্ত "সম্পাদকীয়" গ্রন্থনা থেকে আমরা বিরত থেকেছি। একই কারণে পাঠকের চিঠিও আমরা বাদ দিয়েছি যদিও বহু ভুক্তভোগীর চিঠিতে সংখ্যালঘু নির্যাতনের মর্মন্তুদ বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

শ্বেতপত্রের সময়সীমা বর্ধিতকরণ এবং সীমিত সামর্থের কারণে আমাদের কতগুলো সীমাবদ্ধতা মেনে নিতে হয়েছে। ঢাকা থেকে তিরিশটির মতো দৈনিক প্রকাশিত হয়। শ্বেতপত্রে অন্তর্ভুক্তির জন্য আমরা এর ভেতর থেকে মাত্র ষোলটি দৈনিক বেছে নিয়েছি। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া সহ বিভিন্ন জেলা থেকে কয়েকশ দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ঃ চট্টগ্রামচিত্র' (প্রকাশক ঃ ডকুমেন্টেশন উপকমিটি, চট্টগ্রাম, ফেব্রুয়ারি ২০০২) এবং 'নির্যাতিত সংখ্যালঘু বিপন্ন জাতি' (নির্বাহী সম্পাদক ঃ রানা দাশগুপ্ত, প্রকাশক ঃ সম্পাদকীয় পর্ষদ, চট্টগ্রাম, জানুয়ারি ২০০২) গ্রন্থে চট্টগ্রামের 'দৈনিক আজাদী' ও 'পূর্বকোণ' থেকে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বেশ কিছু সংবাদ সংকলিত হয়েছে যা ঢাকার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। আমাদের সীমিত সামর্থের কারণে ঢাকার বাইরের কোন দৈনিকের সংবাদ আমরা এই শ্বেতপত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি।

এই শ্বেতপত্রে যে সব দৈনিকের সংবাদ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলি হচ্ছে— (১) জনকণ্ঠ, (২) সংবাদ, (৩) ভোরের কাগজ, (৪) আজকের কাগজ, (৫) প্রথম আলো, (৬) যুগান্তর, (৭) ডেইলি স্টার, (৮) ইত্তেফাক, (৯) বাংলাদেশ অবজার্ভার, (১০) ইন্ডিপেন্ডেন্ট, (১১) মুক্তকণ্ঠ, (১২) মাতৃভূমি, (১৩) বাংলাবাজার, (১৪) খবর, (১৫) ইনকিলাব ও (১৬) সমকাল। এই সব পত্রিকার ভেতর মুক্তকণ্ঠ ও মাতৃভূমির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেছে। সমকাল বেরুচ্ছে গত সাত মাস যাবৎ। দৈনিক 'ইনকিলাব' মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তির মুখপত্র হিসেবে পরিচিত। জোট সরকারের আমলে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনা ক্রমাগত অস্বীকার করে চলেছে যে তিনটি দৈনিক পত্রিকা তার অন্যতম হচ্ছে 'ইনকিলাব'। (অপর দুটি বিএনপির মুখপত্র 'দিনকাল' এবং জামাতে ইসলামীর মুখপত্র 'সংগ্রাম') কখনও 'ইনকিলাব'-এ প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে পাঠানো সংখ্যালঘু নির্যাতনের এমন কিছু খবর প্রকাশিত হয়েছে যা তাদের সম্পাদকীয় নীতির পরিপন্থী হলেও বাস্তব বিবেচনা করে আমরা এর কয়েকটি শ্বেতপত্রে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

আমরা এই শ্বেতপত্রে সংখ্যালঘু বলতে ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছি। বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হচ্ছে প্রধানত হিন্দু, খৃষ্টান ও বৌদ্ধ এবং এথনিক সম্প্রদায় হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলে বসবাসকারী আদিবাসী চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, রাখাইন, সাঁওতাল প্রভৃতি ৪৫টি ক্ষুদ্রজাতিসত্তার

অধিবাসী। অনেকে আহমদীয়া মুসলিম সম্পদ্রায়কে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় মনে করেন, কিন্তু আমরা তা মনে করি না। জোট সরকারের জমানায় বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর যে নজিরবিহীন নির্যাতন আরম্ভ হয়েছে এটা সংখ্যালঘু নির্যাতনের মতো জাতীয় ও মানবিক বিপর্যয় হলেও চরিত্রগতভাবে সাম্প্রদায়িক নয়। আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর জামাতে ইসলামী ও তাদের মৌলবাদী সন্ত্রাসী সহযোগীদের নির্যাতনের বিষয়টি ইসলামী মৌলবাদ অর্থাৎ কট্টরপন্থী ওয়াহাবি ইসলামের সঙ্গে উদারনৈতিক ইসলামের দ্বন্দ্বপ্রসূত। এ বিষয়টি আমরা স্বতন্ত্রভাবে পর্যালোচনা করব। আহমদীয়াদের সম্পর্কে জামাতীরা বলে তারা সংখ্যালঘু, এদেশে থাকতে হলে তারা তাদের মুসলমান বলতে পারবে না, তাদের মসজিদকে মসজিদ বলতে পারবে না, অমুসলিমদের মতো উপাসনালয় বলতে হবে। জামাতীদের এই বক্তব্য আমরা সঠিক মনে করি না। বাংলাদেশে মৌলবাদীদের কর্মকান্ড সম্পর্কে যদি আমরা শ্বেতপত্র প্রকাশ করি সেখানে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হবে।

সাত

বাংলাদেশে যে সমস্ত মানবাধিকার সংগঠন সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন অবসানের জন্য কাজ করছে তাদের নাম আগে উল্লেখ করেছি। এসব সংগঠন ছাড়াও ব্যক্তিগত পর্যায়েও অনেক লেখক, সাংবাদিক, সমাজকর্মী সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনের জন্য দেশে ও বিদেশে কাজ করছেন। আমরা যারা সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধাচরণ করি তাদের প্রথম থেকেই জোট সরকার রাষ্ট্রদ্রোহী এবং দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্টকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

এ কথা আমরা বহুবার বলেছি দে'শের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর নির্যাতন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায়। যারা এই ধরনের নির্যাতনের প্রতিবাদ করেন, নির্যাতন অবসানের জন্য কাজ করেন, তাদের কর্মকান্ডে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার বিপরীতে উজ্জ্বল হয়। বাইরের জগৎ তখন জানতে পারে দেশের সব মানুষ অসভ্য বর্বর হয়ে যায়নি, বর্বরতা প্রতিহত করবার মত মানুষও দেশে আছে। জোট সরকারের আমলে আমরা আরও লক্ষ্য করেছি— যখনই কেউ সরকারের কোন নেতা মন্ত্রী বা সরকার— এমনকি বিএনপি জামাতের মতো দলের কোন গণবিরোধী কাজের সমালোচনা করেন তাদের রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এবং কখনও তাদের গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন চালানো হয়। কোন ব্যক্তি, দল বা সরকার যে রাষ্ট্রের সমার্থক নয়— ব্যক্তি/দল/সরকারের সমালোচনা যে রাষ্ট্রের সমালোচনা নয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই 'অ-আ-ক-খ' জ্ঞান জোট সরকারের নীতি নির্ধারকদের মস্তিষ্কে নেই। থাকলে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই বাংলাদেশের এত দুর্ভোগ ও দুর্নাম হতো না।

সাম্প্রদায়িকতা বা সংখ্যালঘু নির্যাতন মৌলবাদেরই একটি অভিব্যক্তি। ধর্মীয় মৌলবাদ কীভাবে মানুষের মগজে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রণোদন সৃষ্টি করে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান এর বাস্তব উদাহরণ। রাষ্ট্র যদি ধর্মভিত্তিক ও মৌলবাদী হয় সেখানে সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না এটা অসম্ভব ব্যাপার। রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হলেও সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করা কঠিন— যদি ধর্মনিরপেক্ষতার কঠোর প্রয়োগ সম্পর্কে রাষ্ট্রের কর্ণধাররা আন্তরিক না হন। মৌলবাদকে উপেক্ষা করে কখনও সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল কিংবা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

বাংলাদেশের জোট সরকারের প্রধান দুই শরিক হচ্ছে জামাতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটের মতো মৌলবাদী সন্ত্রাসী অপশক্তি, যারা, যুক্ত রয়েছে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মৌলবাদী নেটওয়ার্কের সঙ্গে। বাংলাদেশে মৌলবাদীদের পরাস্ত করতে হলে মৌলবাদবিরোধী আন্দোলন ও সংগ্রামেরও বৈশ্বিক ব্যাপ্তি প্রয়োজন। 'সংখ্যালঘু নির্যাতনের শ্বেতপত্র' প্রকাশের পর বাংলাদেশে মৌলবাদীদের কর্মকান্ড সম্পর্কে শ্বেতপত্র প্রকাশের কথা আমরা ভেবেছি। এ ক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে আমাদের বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

আমরা আশা করব এই শ্বেতপত্র আমাদের শ্রেয়োচেতনা জাগ্রত করবে, ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক সমাজ নির্মাণে সহায়ক হবে।

ঢাকা, ১ অক্টোবর ২০০৫

৫ নবেম্বর ২০০৫ ইউইয়র্কে নির্মূল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিনের শ্বেতপত্র প্রকাশনা উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। (ছবিতে বাঁ থেকে) শ্বেতপত্রের সম্পাদক শাহরিয়ার কবির, সভার সভাপতি ডঃ অস্টিন ডেসি, বিশিষ্ট মার্কিন কবি স্ট্যানলি বারকান, যুক্তরাজ্য শাখার উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি ডঃ নূরননবী ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি সাংবাদিক মাহমুদউল্লাহ

কাফ্ফারা সবাইকে দিতে হবে আগে অথবা পরে

মুনতাসীর মামুন

ছবিটি অনেকে দেখেছেন, জনকণ্ঠ বা সংবাদের পাতায়। সংবাদের প্রথম পৃষ্ঠার ওই ছবিটি পূর্ণিমার, যখন চোখে পড়লো সকালে, তখন আপনা-আপনি চোখে পানি চলে এল। কিন্তু কেন? এতো বছর— এতো বিপর্যয়, এতো হুমকির মুখেও তো কখনো বিপর্যস্ত বোধ করিনি। খানিক পর অনুধাবন করলাম, আমারও একটি মেয়ে আছে পূর্ণিমার বয়সী এবং আমি ভেবেছিলাম, এই ছবিটি তো আমার মেয়েরও হতে পারতো। তার পর সারাদিন ফোন পেয়েছি অনেক, রাস্তাঘাটে কথাবার্তা হয়েছে অনেকের সঙ্গে। প্রায় সবাই বলেছেন, মেয়েটি তো আমার মেয়ে বা আমার বোন হতে পারতো। যারা মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে ছিলেন, তাদের অনেকে সমষ্টিগত ডিপ্রেশনে ভুগছেন। পূর্ণিমার একটি ছবি– মুখঢাকা দু'হাত দিয়ে, কিন্তু কী সাহস এসে হাজির হলো আমাদের সামনে, যেন চড় মেরে গেল বাংলাদেশকে। আমরা কেউ তা বুঝি না। আজ মধ্যবয়স শেষে মনে হয়েছে, এতো দেশ থাকতে কেন বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করলাম?

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরেও দৈনিক পত্রিকায় ঠিক এমন একটি ছবি বেরিয়েছিল। মুখঢাকা কিশোরীর। সে ছবি দেখেও অনেকে কেঁদেছিল। পাকি কর্তৃক ধর্ষিত বিধ্বস্ত বাংলাদেশের ছবি। কোনো অমিল নেই ছবি দু'টির। পাঞ্জাবি পাকি নেই বটে, কিন্তু তাদের সহযোগী, প্রত্যক্ষ সহযোগী অনেকের বাড়ি-গাড়িতে এখন বাংলাদেশের পতাকা। অনেকে আওয়ামী বিরোধিতায়, প্রবল প্রতিহিংসার কারণে এসব ভুলে গেছেন। কিন্তু জাতি হিসেবে আমরা যে, না এগিয়ে পিছিয়েছি এটিই তার প্রমাণ। পাকিস্তান করে কি কোনো লাভ হয়েছিল আমাদের? বা হবে কখনো? ১৯৭১-এ পাকি সেনাদের টার্গেট ছিল সব বাঙালি, নির্দিষ্টভাবে হিন্দুরা। অধিকাংশ হিন্দু তখন পালিয়েছে, অনেকে নাম ভাড়িয়ে থেকেছে। মুসলমানদেরও তথৈবচ অবস্থা। জিজ্ঞাসা করা হয়েছে– তুম মুক্তি হ্যায়, আওয়ামী হ্যায়? কারণ, তা হলেই সে হিন্দু নাম মুসলমান হতে পারে। তবে মুসলমান বলে পার পেয়ে গেছেও অনেকে, হিন্দুরা পায় নি। সে সময় পাকি সেনা সরকার বলেছিল, এ-ধরনের সংবাদ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা (দি এলিগেশন অফ ডেলিবারেট একসপালশন অফ পিপল ফ্রম ইস্ট পাকিস্তান প্লু এ ক্যাম্পেইন অফ টেরর ইজ টোটালি ফলস, ম্যালিশাস অ্যান্ড অ্যানওয়াল্ডেড; ১.৬.১৯৭১) বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও একই সুরে একই কথা বলেছেন, 'সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের ব্যাপারে পত্রিকাগুলো অতিরঞ্জিত খবর ছেপেছে। পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ৮০/৯০ ভাগ

ভিত্তিহীন। খবরের কাগজের রিপোর্টের সঙ্গে ডিসি-এসপিদের পাঠানো রিপোর্টের কোনো মিল নেই।' [সংবাদ, ১৬.১০.২০০১] স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একজন প্রাক্তন সৈনিক এবং জেলা প্রশাসনের প্রধানরা নিয়োজিত লতিফুর-মুয়ীদ চৌধুরীর দ্বারা।

১৯৪৭ থেকে হিন্দু নির্যাতনের শিকার। সব সময় দাঙ্গায় তাদের সম্পত্তি দখলের জন্য তাদের ওপর হামলা হয়েছে। ১৯৭১ সালে তা চরমে ওঠে। তার পর থেকে হিন্দুরা কখনো নির্যাতিত হয়নি– এ কথা বলা সত্যের অপলাপ। আওয়ামী, বিএনপি, জাতীয়, সামরিক— সব আমলেই হিন্দুদের বেছে নেয়া হয় শিকার হিসেবে। তারা ঠিক মানুষ হিসেবে বিবেচিত হয় না। তারা হিন্দু বা সংখ্যালঘু। ১৯৭১-এর পর্যায়ে মিলটা আনছে এখন, যা শুরু করেছিল ঠিক পূর্ববর্তী সরকার। বর্তমানে সেটা চরমে উঠেছে। হিন্দু এবং আওয়ামী লীগের সবাই মার খাচ্ছে। কারণ হিন্দু ও আওয়ামী লীগ ও হিন্দু ভারত তাদের ধারণায় এক। অন্তত আওয়ামী লীগ বিরোধীদের ভাষ্য তাই। এটি ঠিক হলে বলতে হয়-গৌতম চক্রবর্তী, গয়েশ্বর রায় বা নিতাই রায়রা হিন্দু নয়। বিএনপি-জামায়াত একটি কথাও বলেনি ভারতের বিরুদ্ধে, যা ত্রিশ বছরে অভূতপূর্ব ঘটনা এবং বলা হচ্ছে এখন ভারতে গ্যাস বিক্রি হবে। তা হলে বিএনপি-জামায়াত হিন্দু ভারতের দালাল? যে মুসলমানরা এদের সমর্থন করছে, তারাও কি মীর নাসিরের ভাষায় 'ভারতীয় রাজাকার?' এখন যেমন আওয়ামী ও হিন্দুদের পিটানো হচ্ছে তাদেরও কি সেভাবে পিটাতে হবে? শিক্ষিত, ভালো কাপড়চোপড় পরা ওসব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমালোচক স্মার্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের বক্তব্য এখন কী?

ইউরোপীয় কমিশন আবার বেশ খানিকটা ইয়ার্কি করেছে। 'সংখ্যালঘুদের ওপর কোনো ধরনের নির্যাতন বা প্রতিশোধমূলক আক্রমণ থেকে বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরত রাখার জন্য তিনি (প্রতিনিধি) বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতাদেরও অনুরোধ করেছেন।' (জনকণ্ঠ ১৪.১০) কিন্তু কেন? আসলেও কিছু ঘটছে কি? আগে, নির্বাচনের সময় ঘটেনি। প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়াও কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণে বিরত থাকার জন্য। নির্বাক প্রেসিডেন্ট হঠাৎ জনাব মান্নান ভূঁইয়াকে ডেকে নির্দেশ দিলেন সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধের জন্য - যা তিনি পারেন না। তার ক্ষমতা ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় যা তিনি করেন নি। আর তাদের কথাবার্তা শুনে ও পত্রপত্রিকা থেকে মনে হয় নির্যাতন হচ্ছে, কিন্তু আলতাফ হোসেন চৌধুরী যে বলছেন, 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনা বিক্ষিপ্ত, ছিটেফোঁটা' (জনকণ্ঠ ২১.১০) তা হলে প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট যা বলছেন তা সত্য নয়। আর ডি সুজা তো ইয়ার্কি করছেন। কারণ, নির্বাচনের আগে ও নির্বাচনের দিন হামলা মামলা চোখে পড়েনি, এখন পড়লো। হিন্দুরা, আমার ব্যক্তিগত মত, যদি পারে দেশ ছেড়ে চলে যাক। আর যদি যেতে না চায়, কারো দিকে প্রত্যাশা না করে নিজের পায়ে দাঁড়াক। বাংলাদেশে কেউ কাউকে সাহায্য করে না, নিজেকে ছাড়া। ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালে বলেছিলেন, সংখ্যালঘুদের দেশে ফেরার ব্যাপারে

কোনো ইতস্তত করা উচিত নয়, তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হবে, কারণ তারা পাকিস্তানের একই ধরনের নাগরিক। 'দে উইল বি গিভেন ফুল প্রটেকশন অ্যান্ড এভরি ফ্যাসিলিটি অ্যাজ দে আর ইকুয়েল সিটিজেন অফ পাকিস্তান অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো কোয়েশ্চেন অফ অ্যানি ডিসক্রিমিনেটরি ট্রিটমেন্ট।' (১৯.৬.৭১) পেয়েছিল কি? আমার ব্যক্তিগত মত, হিন্দুদের যদি থাকতে হয় তাহলে তাদের ভোটাধিকার রহিত করা হোক। তাহলে আওয়ামী লীগও শায়েস্তা হবে এবং তাদের ওপর জিজিয়া কর বসানো হোক যা অনেক মুঘল সম্রাট বসিয়েছিলেন। তাতে যে অর্থ আসবে তাতে বাজেট ঘাটতি ঠেকানো যাবে। অথবা তাদের ভারতে যেতে দেয়া হোক এবং ভারতীয় মুসলমানদের বদলে বাংলাদেশে আনা হোক, তাতে বাংলাদেশের মুসলমানদের আপত্তি হওয়ার কথা নয় এবং এতে জামায়াত-বিএনপির ভোটব্যাংকও বাড়বে। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে ভারতীয় মুসলমানরা মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেনি। না হলে হিন্দু ফ্যাক্টর সব সময়ই ঝামেলা বাঁধাবে।

আওয়ামীবিরোধী এক বন্ধু আমাকে পূর্ণিমার ছবিটি দেখে বলেছিলেন, এগুলো কী হচ্ছে? তিনি কোথায় খবরটি পেয়েছিলেন জানি না। কারণ তিনি ডেইলি স্টার ও ইনকিলাব পড়েন। হয়তো জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ বা সংবাদের কোনো পাঠক তাকে বলেছিল। আমি বললাম, যা হচ্ছে ঠিকই হচ্ছে। তিনি বললেন, মানে? মানে নির্বাচনটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ বিরোধীদের যুদ্ধ। তখনো যেমন মুসলমান ও অবিশ্বাসীদের যুদ্ধ হতো, সে রকম যুদ্ধে পরাজিতরা হচ্ছে গণিমতের মাল। তো আজ বিএনপি ক্ষমতায়; আওয়ামীরা পরাজিত। তাদের ও হিন্দুদের ঘর-সম্পত্তি বৌ-বাচ্চা সব গণিমতের মাল। আবার কখনো আওয়ামী লীগ এলে অন্যদের তা-ই মনে করবে। তার বোধ হয় এ নিয়ে একটু সন্দেহ হচ্ছিল। ওই আর কি মানবিকতাবোধ ছিল। আমি বললাম, আমার ধর্মে যদি এটা বৈধ না হয় তাহলে যে দেশের ৯০ ভাগ মুসলমান, তারা প্রতিবাদ করে না কেন? কোনো মুসল্লি, আল্লাওয়ালা এর প্রতিবাদ করেছেন?

নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের মুসলমানরা তো লাদেনের হয়ে লড়বে বলেছিল। জামায়াত তো জান কুরবান করেছিল। কিন্তু লাদেন তো প্রায় শেষ। পথে দেখি আমিনী-নিজামী কেউ নামে না। স্মার্ট ড্রেসের মুসলমানরাও— যারা মনে করে হিন্দু আওয়ামীদের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে, তারাও চুপচাপ। সুরা বাকারায় আল্লাহ বলেছেন-'নিশ্চয়, যারা বিশ্বাস করে ও আল্লাহর পথে স্বদেশ ত্যাগ করে ও জিহাদ করে, তারাই আল্লাহর দয়ার আশা রাখে, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' আমাদের মতো ভণ্ড আর কই পাবেন? শাবানা আজমী কয়েক দিন আগে ভারতে বলেছিলেন, এতো জিহাদের ডাক দেন দিল্লী জামে মসজিদের ইমাম, কিন্তু যান না তো। তাকে প্যারাসুটে করে কাবুলে ফেলা উচিত। শাবানা জানেন না, আমাদের এখানকার অনেকের মত যে, মুরগি খেয়ে, ঘুম থেকে উঠে ধর্মের নামে মিছিল করে জিহাদ ডাকা আরামের। ধর্মকর্মও হয়,

নিরাপদেও থাকা যায়। কাবুলে তো গুলিগালা। খাওয়া পাওয়া যায় না। আর মরে গেলে ধর্মকর্ম করবে কে?

১৯৭১ সালে অগাস্টেই পাকি সরকার আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার শুরু করেছিল 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য।' আজ দেখলাম, সরকার নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ হাসিনার বিদেশ যাওয়ার ওপর। দেশে যা চলছে তা চলবে, বাড়তেও পারে। এর জন্য কাউকে অভিযুক্ত বা দোষী করছি না। আমি নিজে যে জাতির অংশ, সে জাতি সম্পর্কে আমার সম্যক ধারণা আছে। এক হাজার বছরের ইতিহাসে এ জাতিকে কেউ নন্দিত করেনি। ১৯৭১ সাল ছাড়া। সেটি ব্যতিক্রম। আল্লাহ বলেন, ভগবান বলেন, গড বলেন, তাতে বিশ্বাস রাখেন কী না রাখেন, মানুষের চোখের জলের একটি অভিশাপ আছে। আওয়ামী লীগ যদি মানুষের চোখের জলের কারণে চলে গিয়ে থাকে তাহলে আজ যারা আছে তারও ওই পথে যাবে। পূর্ণিমার ছবিটি আপনি ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন, তারপর কন্যাকে আদর করে স্ত্রী নিয়ে পার্টিতে যেতে পারেন, কিন্তু আমাকে আপনাকে একটি কাফ্ফারা দিতে হবে। কারণ, আমরা এমন অনেক কথা বলেছি যা রাখিনি। 'শপথ করে কথা না রাখলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে' (সুরা মায়িদা)। এরপর আমার আপনার স্ত্রীকে যখন অপহরণ করা হবে, কন্যাটিকে তুলে নেয়া হবে, বোনটিকে গায়েব করে দেয়া হবে, তখন বুঝবেন পূর্ণিমা আসলে কি বলতে চেয়েছিল।

২৪.১০.২০০১

মুরগি চুরির ঘটনায় জাতি লজ্জিত হবে কেন?

মুনতাসীর মামুন

উমা মুহুরী এ কাজটি করলেন কেন বুঝলাম না। নিহত অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীর লাশ ঢাকা দেয়ার জন্য চাদর খুঁজছিলেন বিমান বাহিনীর প্রাক্তন সদস্য, বর্তমানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ চৌধুরী। উমা কাপড় তো দিলেনই না; বরং তাকে বললেন, 'কাপড় দিয়ে বীভৎসতা ঢাকার দরকার নেই, আপনাদের সরকারের আমলে জনগণের নিরাপত্তা কতটুকু আছে, দেশবাসী দেখুক।' (সংবাদ, ১৭.১১.০১)। তার সঙ্গে আরেকজন মন্ত্রী জনাব নোমানও ছিলেন। অন্যরা আসার আগে লাশটি ঢেকে ফেললে ভালো হতো। আলতাফ চৌধুরী তাহলে বলতে পারতেন, ঘটনাটি ঘটেনি।

নোমান বলতে পারতেন, বিষয়টি অতিরঞ্জিত। পুলিশ বলতে পারতো, এ রকম ঘটনা ঘটেছে কি-না। যেমন আওয়ামী আমলে ডিবি অফিসের পানির ট্যাঙ্কে লাশ পাওয়া গেলে সবাই ধরে নিয়েছিল কাক সেটা ফেলে গেছে। আরো মুশকিলে পড়েছে ইনকিলাব ও 'প্রগতিশীল' পত্রিকাগুলো, তারা প্রথম পাতায় বাধ্য হয়ে খবরটি ছেপেছে। সাধারণত আফগানিস্তানই প্রাধান্য পায় বাংলাদেশে। অন্য খুনোখুনি বা টেররিজম নয়। অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী রাষ্ট্রপতি হয়ে গেছেন। নয়তো ইনকিলাব যেমনটি ইঙ্গিত করেছে, তেমন করে বলতো, ছাত্রলীগ ঘটনার জন্য দায়ী। উমা দেবী আপনি এতো লোককে বিব্রত করেছেন। তার ওপর আপনি মুসলমান নন। থাকেন চট্টগ্রামে, যেখানে মন্ত্রী সংখ্যা শুনেছি ছয়-সাতজন এবং সবাই বিশ্বাস করেন গত ৩০ দিনে যা ঘটেছে সবই অতিরঞ্জিত, সেখানে আপনি এ কাণ্ডটি না করলেই পারতেন। এখন বিমান সেনা চৌধুরীর দোস্ত, প্রাক্তন সৈনিক ও বর্তমান পুলিশ প্রধান তদন্ত শুরু করতে হয়তো বাধ্য হবেন এবং পুলিশি তদন্ত বোঝেন? দেখা যাবে, মেয়র মহিউদ্দিন বা বিপ্লবী বিনোদ বিহারী হয়তো এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। জানি না, উমা মুহুরী থাকতে পারবে কি-না সে এলাকায়। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে নিবেদন, সংবাদের এ রিপোর্টটি যারা করেছেন তারা মুসলমান নন, সুতরাং আপনি বা আপনার সরকার তা অগ্রাহ্য করতে পারেন।

সমস্যা বাঁধিয়েছেন ওই এলাকার লোকজনও; মন্ত্রীরা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুকরণে জনগণকে বলছিলেন, সন্ত্রাসীরা যে দলেরই হোক তারা রেহাই পাবে না। হত্যাকারীদের খুঁজে বের করা হবে।' এলাকার লোকজনের উচিত ছিল একথা বিশ্বাস করা। কিন্তু কেন যেন 'হাজার হাজার জনতা রোষে ফেটে পড়েন। তখন বিক্ষুব্ধ জনতা স্লোগান দেয় ও জুতা-স্যান্ডেল প্রদর্শন করে।' (আজকের কাগজ, ১৭.১১.০১)

বিএনপি-জামায়াত জোট ও পুলিশ যখন বেয়াদব জনতার (!) খোঁজ করবে তখন এ জনতা থাকবে? তাদের অনেককেই তখন অপরাধী হিসেবে চালান দেয়া হতে পারে।

ভুল করলেন বিনোদ বিহারী চৌধুরীও। তিনি যখন চট্টগ্রাম বিদ্রোহে যোগ দেন, তখন আলতাফ চৌধুরীরও জন্ম হয়নি। আলতাফ চৌধুরীরা এসব ব্যক্তিকে চেনেনও না। সেটিই ভালো ছিল। এখন এই নব্বই বছর বয়সে কে বলেছিল আপনাকে এতো বড় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখের ওপর বলতে, 'আপনি দেশের সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবের ঘটনাগুলো সংসদে অস্বীকার করেছেন, মীরেরসরাইর দাশপাড়ায় ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবকে সংসদে বক্তৃতা দিয়ে বলেছেন মুরগি চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাশপাড়ার ঘটনাটি ঘটেছে। এ ঘটনাটিও মুরগি চুরির ঘটনার মতো হবে কি-না জানি না। ... আমরাও সংসদ সদস্য ছিলাম। সংসদে অসত্য কথা বলা অন্যায় বলে জানি... ।' (ঐ)

জনাব আলতাফ চৌধুরী, অনুগ্রহ করে শ্রী চৌধুরীর কথায় কান দেবেন না। বৃদ্ধ মানুষ উত্তেজিত হয়ে কী বলে ফেলেছেন। আপনাদের ক্যাডারদের যদি একটু জানিয়ে দেন যে, বিনোদ বাবুর গায়ে যেন হাত না তোলে, তাহলে ভালো হয়। দেখছেনই তো তারা পুরো দেশকে কেমন লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছে। বিনোদ বাবু কিন্তু কোনো দল করেন না। উনি তো আর জানেন না আজকের রাজনীতির মূলই হলো মিথ্যা বলা! চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস আবার জনাব আল নোমানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনারা কি দেশে কোনো মুক্তিযোদ্ধার চিহ্ন রাখবেন না?' [আজকের কাগজ] একজন সাংবাদিক হয়ে তিনি কীভাবে এ প্রশ্ন করলেন জানি না। জামায়াত-বিএনপি সরকার গঠনের পর তারা মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় করেছে। মুক্তিযোদ্ধা না থাকলে এ মন্ত্রণালয় কী করবে? মুক্তিযোদ্ধা থাকবে তবে তাদের হতে হবে জামায়াত-বিএনপি ঘরানার।

আসলে সবকিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করা আমাদের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। লতিফ-মুয়ীদ কোম্পানী যখন জাতিগত ও রাজনৈতিক শুদ্ধি অভিযানের পটভূমিকা তৈরি করেছিল [যা হয়েছিল পুরনো যুগোস্লাভিয়ায়], তখন কি অনেকে মনে করেননি এটি অতিরঞ্জন? তার পর নির্বাচনে যখন রাষ্ট্রপতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন মিলে ম্যান্ডেট দিল জামায়াত ও বিএনপিকে তখনো তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। 'প্রগতিশীল পত্রিকাগুলো' ও ইনকিলাবও বলেছে এগুলো ঠিক নয়। নির্বাচনের সময় নাকি এম. এ. সাঈদের 'দুষ্টু'গুলো চলে গিয়েছিল। নির্বাচনের পর আবার তারা ফিরে যখন লতিফ-মুয়ীদের আরব্ধ কাজ সমাপন করছে, তখন সাঈদ বলেছিলেন নির্বাচনের পর এ রকম এক-আধটু হয়। সুতরাং অধ্যক্ষ মুহুরীর নিহত হওয়াটা সেভাবে দেখুন। ক্ষমতায় গেছে বিএনপি ও পঞ্চাশ বছরের জামায়াত প্রথম। তারপর আনন্দ-উদ্দীপনায় এ রকম এক-আধটু হবেই। তার ওপর তিনি মুসলমান ছিলেন না। হিন্দু বা আওয়ামী সমর্থক মারা গেলে এতো মাতমের কী আছে?

আলতাফ চৌধুরী এতোদিন যা বলেছেন আমরা সেটা বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করার হুকুম আছে। জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ, সংবাদ বিশ্বাস করে না। কারণ তারা শেখ হাসিনার পক্ষ, তাদের মালিকরা/সম্পাদকরা শক্তিশালী। আমরা ছাপোষা, আমরা বাঁচতে চাই। আলতাফ চৌধুরী আগে বলেছেন, তিনি উল্কার মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন। কই হিন্দু ও আওয়ামী নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ তো চোখে পড়েনি। মীরেরসরাইর ঘটনা মুরগি চুরি থেকে উদ্ভূত। এটিও আমরা বিশ্বাস করি। আমরা ছাপোষা মানুষ। আমরা গুলি খেতে চাই না। 'হাসিনা কণ্ঠ' বলে পরিচিত কয়েকটি পত্রিকা লিখেছে, এ হত্যা নাকি শিবিরের লোকজন করেছে। আমরা তা বিশ্বাস করি, আসলে ঘটনাটা হয়েছিল মীরেরসরাইতে কয়েকজন হিন্দু কয়েকজন হিন্দুর মুরগি চুরি করে। এর ফলে কলহ, সংঘাতের সৃষ্টি হয়। বিএনপি-জামায়াতের কর্মীরা হিন্দুদের এ সংঘাত থামাতে গিয়েছিল। যাক, যাদের মুরগি চুরি হয়েছিল তাদের মনে হয়েছিল নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী এতে ইন্ধন যুগিয়েছেন। তিনি আবার বাম দল করেন। বাম দল আবার হরতাল ডেকেছিল ভারতের কাছে গ্যাস বিক্রির উছিলায় বিএনপি-জামায়াতের দেশ বিক্রির প্রতিবাদে। এতে আরেক দল হিন্দু ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। কারণ দেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলে তারা যাবে কোথায়? এ হচ্ছে প্রকৃত ঘটনা। পত্রপত্রিকা যাই বলুক, আমরা এটাই বিশ্বাস করি। আমাদের যেন গুলি করা না হয়। শুনেছি অধ্যাপক, লেখক, শিল্পী, সরকারি কর্মচারি, সাংবাদিক-সব মিলিয়ে হাজার তিনেক জনের একটি লিস্টি দেশের ভবিষ্যৎ এক তরুণ নেতা আপনার কাছে পাঠিয়েছে টাইট দেয়ার জন্য। সে জন্যই এ কথা বার বার বলছি। আপনারা যা হুকুম করছেন আমরা তাই বিশ্বাস করি।

আলতাফ চৌধুরী হঠাৎ বলে ফেলেছেন, 'নির্মম এ ঘটনার জন্য আমি লজ্জিত, সরকার লজ্জিত এবং জাতিও লজ্জিত।' আলতাফ চৌধুরীও বিনোদ বিহারী চৌধুরীর মতো ভাবাবেগে এ কথা বলে ফেলেছেন। কেন তিনি, সরকার এতে লজ্জিত হবে? গত তিন মাসে কি হাজার হাজার মানুষ জাতিগত ও রাজনৈতিক শুদ্ধির কারণে গৃহহারা হয়ে এলাকা ত্যাগ করেনি, বাঙালি নারীরা কী ধর্ষিত হয়নি? কয়েকদিন আগেও চাঁদপুরের কচুয়ায় একজন হিন্দু রমণীকে ধর্ষণ ও হত্যা করে ফেলে দেয়া হয় কচুয়ার রাস্তায়। পুলিশ তো মামলাও করেনি। আওয়ামী লীগ পাঁচ বছরে যা করতে পারেনি জামায়াত-বিএনপি ৩০ দিনে তা সমাপন করে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করেছে। এতে লজ্জিত হওয়ার কী আছে? আর এ জাতিও বা লজ্জিত হবে কেন? একটি মুরগি চুরির ঘটনায় একটি হত্যাকাণ্ড হয়েছে, নিহত ব্যক্তি মুসলমানও না, এতে জাতির লজ্জার কী আছে? আলতাফ চৌধুরীর [যিনি সংসদে অবলীলায় সত্য নয় এমন কথা বলেন] স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিত্বে জাতির লজ্জা হয় না, এথনিং-পলিটিক্যাল ক্লিনসিংয়ে জাতির লজ্জা হয় না, নিজামী পতাকা উড়িয়ে ঘুরে বেড়ায় জাতির লজ্জা হয় না, একটা সামান্য ফরেনও নয়, দেশি মুরগির চুরিতে জাতি লজ্জিত হবে কেন?

১৮.১১.২০০১

আদালতের কাঠগড়ায় শৃঙ্খলিত মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িকতা

মুনতাসীর মামুন

আসামী পক্ষের আইনজীবীরা বললেন, তিনি রাষ্ট্রীয় সম্পদ। সরকার পক্ষের পুলিশ ইন্সপেক্টরও বললেন, তিনি রাষ্ট্রীয় সম্পদ। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সম্পদ শাহরিয়ার কবিরের হাতে তখন হাতকড়া, পুলিশবেষ্টিত অবস্থায় কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। পৃথিবীর একমাত্র সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশেই ঘটনাটি ঘটেছে গত পরশু। এতে বোঝা যায়, বাংলাদেশের শাসকরা রাষ্ট্রীয় সম্পদকে কিভাবে দেখেন।

শাহরিয়ার কবির দীর্ঘ ত্রিশ বছর সংগ্রাম করে আসছেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে, অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষে। তাঁর সাংবাদিকতা, লেখালেখি, ডকুমেন্টারি, সাংগঠনিক কাজকর্ম– সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুই ছিল ঃ এ দু'টি বিষয়। রাজনীতিকরা তাঁকে পছন্দ করতেন না কিন্তু ব্যবহার করতে চাইতেন এবং যেহেতু তিনি আবেগী, ব্যবহৃতও হয়েছেন। ভদ্র সংস্কৃতি কর্মীরাও তাঁকে এড়িয়ে চলতেন। কারণ তাঁর কর্মে কোনো আপোস ছিল না।

বিএনপি ১৯৯১ সালে তাঁকে চাকরিচ্যুত করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করায় আজ এক দশকেও তিনি আর কোথাও চাকরি পাননি। কারণ পত্রিকা মালিকরাও তাঁর সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। বেকার জীবন চলেছে, চিত্রকলা সংগ্রহ বিক্রি করে, লেখালেখির টাকায়। কিন্তু কাঁধ থেকে নামাতে পারেননি মুক্তিযুদ্ধ এবং অসাম্প্রদায়িকতা। দেশের রাজাকার বা যুদ্ধাপরাধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক তিনি। মানবতাবাদ বিরোধীর বিপক্ষে আপোসহীন যোদ্ধা। তিনি শাসক, ভীরু মধ্যবিত্তের পছন্দের নয়। কিন্তু বাংলাদেশে তিনিই এক ধরনের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ও অসাম্প্রদায়িকতার। বিশেষ করে বর্তমান নির্বাচনের পর সেই শাহরিয়ার কবিরকে হাতকড়া পরা অবস্থায় কাঠগড়ায় থাকার অর্থ মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িকতাকে হাতকড়া পরিয়ে আদালতে হাজির করা। এ দৃশ্য দেখে আদালত কক্ষে অনেকের চোখ ভরে উঠেছিল পানিতে, 'শেম শেম' ধ্বনি উঠেছিল আদালত কক্ষেই। এমনকি সারা আদালতে পুলিশদেরও দেখেছিলাম ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে, যে পুলিশকে মানুষ এখন সবচেয়ে অপছন্দ করে।

বিএনপির একটি অবসেশন হলো রাষ্ট্রদ্রোহী খোঁজা। এর কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। কারণ বিএনপির স্রষ্টা ক্ষমতায় এসেছিলেন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে, যা রাষ্ট্রদ্রোহিতা। বিএনপির নেতৃত্বের একটি বড় অংশ ছিল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী। সমাজে নিজেদের চেহারা ঢাকতে তাদের সব সময় দরকার হয়ে পড়ে রাষ্ট্রদ্রোহী খোঁজা। ১৯৯২ সালে বিএনপি ২৪ জন শিল্পী-সাহিত্যিককে আদালতে দাঁড় করায় রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায়।

এবারও ক্ষমতায় গিয়ে তারা খুঁজে পেয়েছে একজন রাষ্ট্রদ্রোহীকে। উল্লেখ্য, তারা কোনো ঋণখেলাপী মস্তান, রাজনীতিবিদদের মাঝে রাষ্ট্রদ্রোহী খুঁজে পায়নি, খুঁজে পেয়েছে শুধু লেখক শিল্পীদের মাঝে। আগেও এবং এখনও।

শাহরিয়ারকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৫৪ ধারায়। এ ধারায় সাধারণত সন্দেহজনক গতিবিধির মানুষজনকে ধরা হয়। পুলিশ সাধারণ পতিতা, দালাল, ভবঘুরে এ ধারায় ধরে। যেমন সীমা চৌধুরীকে ধরা হয়েছিল এবং পরে চট্টগ্রাম জেলে যাকে মেরে ফেলা হয়। শাহরিয়ারকেও অনেকের ধারণা গুম করে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল কিন্তু তরুণ সাংবাদিকরা তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতে থাকলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। থানার অভিযোগে বলা হয়েছে, শাহরিয়ার "বাহিরে অবস্থান করিয়া বাংলাদেশে নির্বাচনোত্তর কিছু সহিংস-ঘটনার স্থিরচিত্র কতিপয় সংখ্যালঘু লোককে প্ররোচিত করিয়া কথিত সহিংস ঘটনার ব্যাখ্যা তৈরি পূর্বক জনগণের বিভ্রান্তি ক্ষোভ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কিছু ভিডিও চিত্রধারণ করে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন যা "বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টসহ আইনশৃঙ্খলার পরিপন্থী ও রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর এবং তিনি এই ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত রহিয়াছেন। তাহার এই বিভ্রান্তিকর ধারণকৃত ছবি ও বক্তব্য প্রচারিত হইলে সমাজে মারাত্মক আইনশৃঙ্খলা অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।" তাঁকে ১৯৭৪ সালের বিশেষ আইনে আটকেরও আবেদন জানানো হয়েছে। এই তৃতীয় শ্রেণীর বাংলায় লেখা আবেদনের মূল বিষয় হলো— শাহরিয়ার কলকাতায় গেছেন। বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত নির্যাতিত হিন্দু চলে গেছে সেখানে তাদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছেন এবং তা নিয়ে এসেছেন। এতে রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হতে পারে। জনগণের মাঝে ক্ষোভ ও বিভ্রান্ত সৃষ্টি হতে পারে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে, রাষ্ট্রের পক্ষে তিনি ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত অর্থাৎ রাষ্ট্রদ্রোহী। এখানে লক্ষণীয়, এর কোনো কিছুই প্রদর্শিত হয়নি এবং একজন সাংবাদিকের মৌলিক অধিকার হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ।

প্রথম কথা লতিফ-মুয়িদের আমল থেকে হিন্দু ও আওয়ামী নির্যাতন শুরু হয়েছিল কিনা? তাদের সেই প্রকল্প বিএনপি-জামায়াত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কার্যকর করেছে। লতিফুর এখন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় যমুনায় আর মুয়িদ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ব্র্যাকের প্রধান নির্বাহী। এখন প্রশ্ন নির্বাচনের পর বিএনপি-জামায়াতরা হিন্দু শূন্য ও আওয়ামী শূন্য করার জন্য আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ গ্রহণ করেছিল কিনা? এ সরকার যদি বলে তা করেনি, তাহলে বাংলাদেশের সমস্ত খবরের কাগজ (ইনকিলাব ও দিনকাল বাদে) মিথ্যা সংবাদ প্রচার করছে। হাসিনাকণ্ঠ বলে পরিচিত কাগজগুলোর কথা বাদ দিলাম কিন্তু মাহফুজ আনাম, মতিউর রহমান ও গোলাম সারোয়ার সম্পাদিত কাগজেও তো ছিটেফোঁটা এসব খবর এসেছে। তাহলে তারা কি সমাজে বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছেন। বিবিসি নিত্য এ সংবাদ প্রচার করছে। শেখ হাসিনা চিৎকার করে বলছেন। বীর আলতাফ চৌধুরী তাদের গ্রেফতার করছেন না কেন? কারণ এদের পিছনে আছে রাজনৈতিক শক্তি, সামরিক-বেসামরিক আমলা, বড় কোম্পানি, ঋণখেলাপী। শাহরিয়ারের পিছে তেমন কোনো শক্তি নেই।

সমাজে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে বা ছড়াচ্ছে কে? আলতাফ চৌধুরী প্রথম থেকে হিন্দু নির্যাতন, আওয়ামী নির্যাতনকে উপেক্ষা করে প্রকৃত অবস্থা খাটো করে দেখিয়েছেন ও দেশে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। পূর্ণিমার কাহিনী যদি বানোয়াট হয় যা বলেছেন এতদিন বিএনপি নেতৃবৃন্দ তাহলে আজ কেন পূর্ণিমার ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে? মান্নান ভূঁইয়া ৯টি ঘটনার ২টি স্বীকার করে কেন সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন? দেখা যায়, নির্বাচনোত্তর কালে সমাজে আলতাফ চৌধুরী, মান্নান ভূঁইয়া, বিএনপি নেতৃত্বরা বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন। তাঁরা রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়েন না, পড়ে শাহরিয়ার। আজ (২৬ নবেম্বর) 'প্রথম আলো'য় ছাপা হয়েছে বাংলাদেশে নির্যাতিত হিন্দু পরিবারের কলকাতায় আশ্রয়ের কাহিনী। এই কাহিনীটি শাহরিয়ার হয়ত ভিডিও বন্দি করেছেন। তো আলতাফ চৌধুরী বা গোয়েন্দা সংস্থার কোমরে জোর আছে মতিউর রহমানকে হাতকড়া বেঁধে আদালতে হাজির করার?

সমাজে সহিংস আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়েছে এবং ঘটাচ্ছে কারা। সহিংসার মাস্টার প্ল্যান শুরু হয়েছে লতিফুর-মুয়িদের আমল থেকে। তাদের কাঠগড়ায় আনা হবে না কেন? প্রেসিডেন্ট বদরুদ্দোজা চৌধুরী অশালীন ভাষায় সাবাস বাংলাদেশ প্রচার করে সমাজে সহিংসতার বীজ কী ছড়াননি যাতে অনুপ্রাণিত হয়ে বিএনপি ক্যাডাররা বাংলাদেশে ত্রাসের রাজত্ব ঘটিয়েছে। জামায়াত ক্যাডাররা অধ্যক্ষ মুহুরীকে হত্যা করে। আড়াইহাজারে পুলিশ ডাকাতি করে। মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী তালামিস্ত্রী ও পুলিশ নিয়ে সংসদ দখল করে। বেগম জিয়া ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকে শৌচাগার থেকে সংসদ ভবনের কক্ষ সব দখল হয়ে যায়, চাঁদাবাজিতে অনেকে গৃহহারা, নির্যাতনে কাতর– এগুলো কি অপরাধের কোটায় পড়ে না। শাহরিয়ার কোনো কিছু দখল করেননি, স্মাগলিংয়ে যুক্ত নন– তিনি সমাজে বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছেন আর অন্যরা ভালোবাসা বিলাচ্ছে? কই গোয়েন্দা সংস্থা বা আলতাফ চৌধুরীর তো সাহস হয় না তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার। প্রতিদিন ইনকিলাবের মিথ্যা, হ্যাঁ, মিথ্যা প্রচার করে মুসলমানদের মধ্যে হিংসাদ্বেষ সৃষ্টি করছে। আলবদর পরিচালিত এই পত্রিকাটি তো মঈন খান বন্ধ করেন না। পুরো দেশটাকে হাওয়া ভবন যদি ভাবেন আর ভাবেন সব মানুষ হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে তাহলে তো মুশকিল।

আসলে মূল বিষয় অন্য। পত্রিকায় দেখেছি, অনেকে অনুমান করছেন কারও চাপে পড়ে কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনার শাহরিয়ারের বিরুদ্ধে রিপোর্ট পাঠান। ভারত এখন বাংলাদেশের হিন্দুদের হরিজন মনে করে। এতদিনে ভারত পেয়েছে একটি সরকারকে যে তার হুকুমে চলবে এবং চিরশত্রু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করবে। সে জন্য গ্যাস বিক্রির অছিলায় দেশ বিক্রি তো আছেই, হুকুমও তামিল করতে হয়। এ রকম চললে উপমহাদেশে বিএনপি-জামায়াত বাংলাদেশকে ভারতের সেবাদাসীতে পরিণত করবে সন্দেহ নেই। শাহরিয়ার সেখানে হিন্দু নির্যাতনের কথা বলবেন এটি এখন আর ভারতীয়দের

পক্ষে মানা সম্ভব নয়। এখানে মানবিকতার প্রশ্ন গৌণ। অন্য বিষয়গুলো আদালতেই তুলে ধরেছে শাহরিয়ারের আইনজীবীরা।

১. "রাজাকার আলবদররা রাষ্ট্রক্ষমতায় বসেছে বলেই মুক্তিযোদ্ধাদের অপমানিত করা হচ্ছে।"

২. "একাত্তরের ১৪ ডিসেম্বর দেশকে ধ্বংস করার জন্য রাজাকার আলবদররা যেভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল সেই নীলনক্সায় আবারও বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।"

৩. শাহরিয়ার মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তাই "রাজাকার আলবদররা তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে শাহরিয়ারকে আটক" করেছে।

৪. আদালতে জাতীয় জীবনে লাথির ভূমিকা তুলে ধরা হয়। বলা হয়, এই এজলাসেই লাথি মেরে দরজা প্রায় ভেঙ্গে ঢোকা হয়েছিল যাতে আসামীদের জামিন দেয়া হয় এবং দেয়া হয়েছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রেও লাথির ভূমিকা আমাদের অজানা নয়। লতিফুরের দরজায় বিএনপি অ্যাকটিভিস্টরা লাথি মেরেছিল, প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীনকে অপমান করেছিল, জুতা ছুড়েছিল, এমএ সাঈদকেও পদাঘাত করা হয়েছিল। যার ফলে তারা সবাই জামায়াত-বিএনপির পক্ষে কাজ করছেন বলে রটনা রয়েছে।

৫. আদালতে এও বলা হয়, ১৯৯২ সালে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় জামিন হয়েছে। হাইকোর্ট হিন্দুদের নির্যাতনের প্রশ্নে রুলনিশি জারি করেছে। সুতরাং হিন্দু নির্যাতন হয়েছে তা বাস্তব ও সত্য ঘটনা। সেটি যদি কেউ তুলে ধরে [যা ব্যাপকভাবে তুলে ধরছে পত্র-পত্রিকায়] তাহলে তা রাষ্ট্রদ্রোহিতা হবে কেন?

আদালতে গতকাল বিচারের সময়ই আইনজীবীরা ও সাধারণ দর্শকরা বলছিলেন, শাহরিয়ারকে জামিন দেয়া হবে না। মামলার কোনো বিষয়বস্তু নেই প্রতীয়মান হওয়ার পরও জামিন হয়নি। তার মানে সবার কাছে সরকারের ইচ্ছা স্পষ্ট যে সরকার প্রতিশোধ গ্রহণে ইচ্ছুক। এক তরুণ আমাকে বলছিলেন, স্যার মন খারাপ নাকি আপনাদের? রাজাকারদের দেশে তো এ রকম হবেই। না, আমার মন খারাপও না, দেশটাকে পুরোপুরি রাজাকারের দেশও আমি ভাবি না। একজন আইনজীবী বলছিলেন, "১৯৯৭ সালে জানুয়ারি মাসে এই আদালতে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের হাজির করা হয়েছিল। তখনও তাদের হাতকড়া পরানো ছিল না। আজ দেশের বিশিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহরিয়ার কবিরকে আদালতে হাতকড়া পরিয়ে হাজির করা হয়েছে। এ লজ্জা গোটা জাতির।" হায়, ইতিহাস পড়লে তিনি জানতেন, এ জাতির চোখের চামড়া নেই। থাকলে এ জাতির সরকার পরিণত হতো না ধর্ষণকারী ও মানবতাবিরোধী সরকার হিসাবে যে কারণে এদের পরম মিত্র বুশ প্রশাসন ও বাজপেয়ীও এখন কুণ্ঠিত। যেখানে নিজেদের কেউ ধর্ষিত না হলে মন্ত্রীরা বোঝেন না ধর্ষণ কি, সন্ত্রাস কি, যেখানে সরকারি দলের রাজনৈতিক এজেন্ডা জাতি শুদ্ধি ও রাজনৈতিক শুদ্ধি, সে জাতির আবার লজ্জা কি।

২৭.১১.২০০১

ধর্ষক, খুনি, লুটেরাদের দেশে পরিণত করা হচ্ছে বাংলাদেশকে

মুনতাসীর মামুন

ঢাকা বা চট্টগ্রামে সকালে পত্রিকা পড়ে খানিকটা ক্ষুব্ধ, খানিকটা হতাশ হতে পারেন বা বিএনপি-জামায়াত সমর্থক হলে বলতে পারেন ইনকিলাব ছাড়া সব পত্রিকাই তো দেখছি আওয়ামী লীগের সমর্থক হয়ে গেল। সব বিষয়ে তারা খানিকটা অতিরঞ্জন করবেই। তারপর, পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলে রওনা হতে পারেন কর্মস্থলে। কিন্তু মেট্রোপলিটন সীমার বাইরে সৃষ্টি হয়েছে অন্য এক বাংলাদেশের, যে বাংলাদেশের সঙ্গে হে মেট্রোপলিটনবাসী আপনাদের কোনো পরিচয় নেই। সে বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে ধর্ষক, খুনি, লুটেরাদের দেশে। সেখানে প্রশাসনের কোনো কর্তৃত্ব নেই বা প্রশাসন ও বিএনপি-জামায়াতকে আলাদাভাবে দেখার উপায় নেই, প্রশাসন যেন তাদের অঙ্গসংগঠন আর পুলিশ হচ্ছে ক্যাডার বাহিনী। সে বাংলাদেশ কেমন তা পত্রিকা পড়ে বোঝা সম্ভব নয়।

মেট্রোপলিটনের বাইরে যদি আপনি যান, তাহলে আপাতদৃষ্টিতে আপনার মনে হবে না তেমন কিছু ঘটছে। ক্ষেতে কৃষক কাজ করছে, হাটবাজার বসছে। কিন্তু কারো মুখে হাসি নেই, কারণ কেউ জানে না কখন কী ঘটবে? একটা বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে না কারো কাছে তাহলো, কেন বিএনপি দেশটিকে ধর্ষক, খুনি, লুটেরাদের দেশে পরিণত করতে চাচ্ছে? জামায়াত চাইতে পারে। তারা বাংলাদেশ চায়নি, এখনো চায় না। তারা চায় দেশটি আঁস্তাকুড়ে পরিণত হোক। মানুষ জী জী করুক। তাতে তাদের প্রতিশোধস্পৃহা তৃপ্ত হবে। অনেকে বলতে পারেন, বিএনপি কি এখন আর স্বতন্ত্র কোনো দল? জামায়াতের সঙ্গে তো তাদের আলাদা করাই মুশকিল। বরং দুই দলের মধুর মিশ্রণে সৃষ্ট হয়েছে নতুন এক দলের, যার নাম দেয়া যেতে পারে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী জামায়াত দল বা সংক্ষেপে ইংরেজিতে বিএনজেপি। হয়তো বলতে পারেন জেনারেল জিয়া পাকিকরণের যে প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছিলেন বাংলাদেশ মূল্যবোধ বিনষ্ট করে, এখন তা-ই পরিণতি লাভ করছে। হয়তো বা।

বাংলাদেশকে বর্তমানে দুঃস্বপ্নের একটি দেশে পরিণত করার জন্য 'বিএনজেপি' কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। সোনার বাংলা এ দেশ কখনো ছিল না; কিন্তু স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল সোনার বাংলার। সেই স্বপ্ন নিয়ে দেশ স্বাধীন হলো, কিন্তু সোনার বাংলা স্বপ্ন—স্বপ্নই থেকে গেল। ১৯৭২ সালের পর আওয়ামী লীগ কর্মীদের, তারপর সাফারি পরা যুবকদের, এরপর টিনপট ডিকটেটরের জাতীয়

বাহিনীর কাছে পদদলিত হয়েছে স্বপ্ন। এরা যে যখন ক্ষমতায় থেকেছে, তখনই দেশটিকে ভেবেছে পৈতৃক সম্পত্তি।

১৯৯০-২০০১-এ সময় বিএনপি ও আওয়ামী লীগারদের বেশি-কম দাপট আমরা দেখেছি। দেশকে পৈতৃক সম্পত্তি ভাবার প্রবণতায় তখন খানিকটা ভাটা পড়েছিল। এর কারণ, বৃদ্ধি পাচ্ছিল মানুষের ক্রোধ, সচেতনতা। মানুষ আর ঠিক আগের মতো নেই। দেখলে মনে হয় বশংবদ কিন্তু কখন আবার জ্বলে ওঠে কে জানে!

বিএনজেপি ক্ষমতায় আসার পর সেই পুরনো ভাব আবার ফিরে আসছে। মনে হচ্ছে, নিলামে তারা দেশটিকে কিনে নিয়েছে। লতিফুর-সাঈদ-মুয়ীদরা তাদের এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে সাহায্য করেছেন সংসদে, তাতেই এ ভাবটা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিএনজেপি কর্তৃত্বে বলিয়ান হয়ে গত পাঁচ মাসে এমন এক সংস্কৃতি তৈরি করেছে, যার নাম দেয়া যায় জাতীয়তাবাদী ঝটাঝট সংস্কৃতি। অর্থাৎ যা করতে ইচ্ছে হবে তা-ই করবে ঝটাঝট। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা বা দেশ-মানুষের কথা ভাবার প্রয়োজন নেই। এই সংস্কৃতির মূল হচ্ছে ভায়োলেন্স। সেই ভায়োলেন্স যত তীব্র হবে তত উত্তম। এর উদ্দেশ্য, মানুষকে দমিত রাখা এবং সাধারণের মধ্যে এক ধরনের হতাশা-বিষাদের সৃষ্টি করা। বিষাদিত জীবনের অপর নাম মৃত্যু।

জাতীয়তাবাদী ঝটাঝট সংস্কৃতির উদাহরণগুলো পত্র-পত্রিকায় প্রতিদিন আপনারা দেখছেন। নতুন করে কিছু বলার দরকার নেই। কয়েকদিন আগে আন্ধারমানিক নদী পেরুচ্ছি এক ফেরিতে, কথাচ্ছলে একজন বললেন, চাঁদা দিতে হবে, না দিলে খুন; মেয়ে দিতে হবে, মেয়ে না থাকলে তরুণী স্ত্রী তো আছে, আর যদি মেয়ে না থাকে ব্লাডমানি হিসেবে টাকা দিতে হবে। বিএনজেপির রাজত্বে থাকলে এ-ধরনের দাসত্ব বা জিজিয়া কর দিতে হবে। এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য হিন্দু, আওয়ামী লীগ বা বিরোধীদের বেলায়। গত এক সপ্তাহের চিত্র আগের এক সপ্তাহ থেকে খারাপ। ঈদের ছুটিতে সারা দেশে খুন হয়েছে ৪৮ জন, এক ঢাকাতেই ২২ জন। আসামি গ্রেপ্তারে পুলিশের উৎসাহ নেই। (প্রথম আলো) কারণ তারা নিজেদের এখন ভাবে বিএনজেপির অঙ্গসংগঠন হিসেবে। 'পুলিশ রেকর্ড অনুযায়ী গত ১ ফেব্রুয়ারি হতে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঢাকা মহানগর এলাকায় খুন হয়েছেন ৪৬ জন।' (বাংলাবাজার পত্রিকা, ২.৩.২০০২) সন্ত্রাসীদের কীভাবে সাহায্য করা যায়, পুলিশ বরং সে প্রচেষ্টায়ই ব্যস্ত। রূপসা-তেরখাদা উপজেলায় কয়েকদিন আগে যে ভয়াবহ তাণ্ডব হলো, তার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, 'বাধাল গ্রামের একমাস বয়সী শিশুও পুলিশের নির্মমতা থেকে রেহাই পায়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে বাধাল গ্রামবাসীদের মতে, পুলিশ দুর্জনীমহল এবং মোকামপুরের সন্ত্রাসীদের রক্ষা করে তাদের ওপর অত্যাচার করেছে। দুর্জনীমহলবাসীদের অভিযোগ, পুলিশ বাধালের সন্ত্রাসীদের রক্ষা করে তাদের আক্রমণ করেছে।' (জনকণ্ঠ, ২.৩.২০০২)।

বিএনজেপির কর্মীরা নির্বাচনের পরপর পূর্ণিমার মতো কয়েকশ' মহিলা (কিশোরী)-কে ধর্ষণ করেছে। কোনো বিচার হয়নি। কয়েকদিন আগে আওয়ামী সমর্থকের মেয়ে মহিমাকে ধর্ষণ করেছে, গণধর্ষণ। আপনাদের কারো কি পূর্ণিমা বা মহিমার বয়সী মেয়ে আছে? ধানের শীষে পুলক করে যারা ভোট দিয়েছেন, দেখুন তো কেমন লাগে। আরেকটি ঘটনার কথা কি মনে আছে? আরেক কিশোরীর মা হাত জোড় করে বিএনজেপির গণধর্ষকদের মিনতি করে বলছে- বাবারা, আমার মেয়েটা ছোট। আপনারা একজন একজন করে আসেন। ভাবছেন, ধানের শীষে ভোট দিয়েছেন, আপনাদের এমন মিনতি করতে হবে না? পূর্ণিমার মাও ধানের শীষে ভোট দিয়েছিল।

প্রাক্তন বায়ুসেনা আলতাফ চৌধুরীও গেছেন মহিমার বাসায় এবং কেঁদেছেন। আলতাফ চৌধুরীর কান্না যদি আন্তরিক হতো, তাহলে তিনি বলতেন না, আওয়ামী লীগ আমলেও ধর্ষণ হয়েছে তার বিচার হয়নি দেখেই আবার ধর্ষণ হয়েছে। এটা রাজনৈতিক প্রতিশোধ নয়, সন্ত্রাসী ঘটনা। তার মানে কি সন্ত্রাসীরা ধর্ষণের অধিকার রাখে। নিশ্চিত থাকুন, আলতাফ চৌধুরীরা যতদিন আছেন, ততদিন কেউ কোনো বিচার পাবেন না। যেমন পায়নি পূর্ণিমা, সীমা, ইন্দ্রানী। পূর্ণিমা সাহসী কিন্তু অন্যরা আত্মহত্যা করে বেঁচেছে। কারণ এদেশে ধর্ষিত হয়ে বেঁচে থাকা আরো যন্ত্রণার। কারণ ধর্ষকরা তো সামনেই ঘুরছে। 'বিএনপি নেতার সহায়তায় মহিমা ধর্ষক ছাত্রদল ক্যাডাররা ভারতে পালিয়েছে।' (জনকণ্ঠ, ঐ) আরো আছে, 'মহিমার পরিবারকে জেলা ও পুলিশ প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে— আওয়ামী লীগ কর্মী বলে পরিচয় দিলে কোনো লাভ নেই। সরকার বিএনপি-জামায়াতের। আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ করলে মেয়ের বিচার তো পাবেনই না; উপরন্তু আপনাদের ক্ষতি হবে বলে কর্মকর্তাদ্বয় মহিমার বাবাকে শাসান বলে সূত্রটি জানায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চলে যাওয়ার পর থেকেই পুলিশ ও বিএনপি সমর্থকরা যৌথভাবে মহিমাদের বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছে।' (সংবাদ, ২.৩.২০০২) শুধু তা-ই নয়, গতকাল খাদ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গ্রেপ্তারের দশ ঘণ্টার মধ্যে নারী নির্যাতনকারীকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। (ঐ)

সুতরাং আইন আবার কী? আমরা কি দেখিনি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বৈঠক করছেন টপটেররদের সঙ্গে। পুলিশের বাবার সাধ্য আছে সেইসব টেররের গায়ে হাত দেয়ার? বিএনপির মতে, এরা দলের ত্যাগী কর্মী। বুঝুন একবার। মাত্র একদিনের, হ্যাঁ একদিনের পত্রিকা থেকে ঝটাঝট সংস্কৃতির কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি:

১. বিএনপি ও ছাত্রদলের ক্যাডাররা গত বৃহস্পতিবার রাতে নাটোরের লালপুর উপজেলার আওয়ামী লীগ সমর্থক একটি বাড়িতে ঢুকে প্রতিপক্ষকে না পেয়ে তার স্ত্রীর মাথায় গুলি করে এবং ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে কুপিয়ে জখম করে ফিরে আসার সময় বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এক ভাগ্নেকে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করেছে।

২. বাগেরহাটে যুবলীগ কর্মীর চোখ উপড়ে রগ কেটে নিয়েছে যুবদলের দুই ভাই।
৩. মুন্সীগঞ্জে আওয়ামী লীগ কর্মীর দুই পায়ের রগ কর্তন।
৪. চিফ হুইপের পুত্রের বাহিনীর চাঁদাবাজি গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত এবং মিওর-শিবালয় এলাকায় 'সন্ধ্যা লাগার সঙ্গে সঙ্গে দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যায়'। এসব খবর কোনো হাসিনা কণ্ঠের নয়, দৈনিক প্রথম আলোর।

বিএনপির প্রথম একশ' দিনে সারা দেশে খুন হয়েছে ৯২৯ জন, ধর্ষিত হয়েছে ২৬৯ জন, অ্যাসিড নিক্ষেপের শিকার ৩০০০, হিন্দুর বাড়িঘর ধ্বংস ৪০০০ ও ক্যাডারদের হাতে নির্যাতিত হিন্দুর সংখ্যা ৫০০০। বিরোধী দলের নির্যাতিতদের খবর এখানে নেই। (ইত্তেফাক, ২৬.১.২০০২) উল্লেখ্য, ইত্তেফাকের দুইজন মালিকই আওয়ামী লীগ বিরোধী।

এ সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এর কারণ অনেক। তবে কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে। লতিফুর সাঈদ-মুয়ীদ গং যখন বিএনপি-জামায়াতকে ক্ষমতায় বসানোর প্রক্রিয়া শুরু করে, তখন তাতে বেজায় সায় ছিল আমেরিকার, পশ্চিমের কিছু দেশ ও ভারতের। বিভিন্ন বিষয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের উপদেশ তখন প্রায়-ই শুনতাম। কারণ এদের কাছে মানুষ বড় কিছু নয়, দেশের ভৌগোলিক সীমা ও সম্পর্কই মূল। বিএনজেপির দর্শনও তা-ই। দরিদ্র দেশের মানুষকে তারা বোঝা মনে করে। বাংলাদেশে যা ঘটছে তা কি সত্য? জানতে চেয়েছিলেন বৃটিশ পার্লামেন্টের এক সদস্য। জবাবে ঢাকার ব্রিটিশ হাইকমিশন থেকে বিএনজেপির মতো জানানো হয়েছে, না তেমন কিছু ঘটছে না। কয়েকটি ঘটনা তদন্ত করে দেখা হয়েছে তা ফলস। এই যে দৃষ্টিভঙ্গি তা আশ্বস্ত ও উৎসাহিত করেছে বিএনজেপি নেতাকর্মীদের। এই দলের নেতারাও কর্মীদের হাতে আইন তুলে নেয়ার প্রশ্রয় দিয়েছেন। আপনাদের মনে আছে কি-না জানি না, গণপিটুনিতে যখন মানুষ হত্যা করা হয়েছে তখন প্রাক্তন বায়ুসেনা, বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইজিপি বলেছিলেন মৃদুহেসে, মানুষের সচেতনতা বাড়ছে। অর্থাৎ হত্যা করার ক্ষেত্রে। গত ত্রিশ বছরে কোনো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা আইজিপি একথা বলেননি। এরই সূত্র ধরে ডাক প্রতিমন্ত্রী আহসানুল হক মোল্লা বলেছেন, 'সন্ত্রাসীদের চোখ উপড়ে ফেলা হবে।' (ইত্তেফাক, ২৭.২.২০০২) অর্থাৎ কে অপরাধী বা কী হবে তার শাস্তি তা নির্ধারণ করবে বিএনজেপির নেতারা।

পুলিশি সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিন ১০ জন ধর্ষিত হচ্ছে ও নির্যাতিত হচ্ছে ৩৭ নারী ও শিশু। পুলিশের হিসাব সাধারণত রক্ষণশীল। আসল হিসাব এর দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে আদালত মামলার দুর্বলতার কারণে শিশু ও নারী নির্যাতন আইনে দায়ের করা ৯৫ ভাগ মামলার আসামির কোনো সাজা হচ্ছে না। এ বছর নারী নির্যাতন আইনে দায়ের করা মামলার সব আসামিই খালাস পেয়ে গেছে বলে সূত্র জানায়। (জনকণ্ঠ ২.৩.২০০২)।

এই হারে ধর্ষণ, নির্যাতন ও খুন বাড়তে থাকলে বিএনপি সমর্থকদের পরিবারও ধর্ষণ, নির্যাতন ও খুন থেকে রক্ষা পাবেন কি-না সন্দেহ। বাংলাবাজার পত্রিকা খবর দিয়েছে, 'নিজ দলের লোকজনও রেহাই পাচ্ছে না।' (২.৩.২০০২) কারণ ধর্ষক, খুনিদের প্রায় ক্ষেত্রে বিচার হয় না, তারা শাস্তি পায় না। জাতীয়তাবাদী ঝটাঝট সংস্কৃতির দ্রুত বিস্তার হচ্ছে। প্রতিটি ধর্ষণ, প্রতিটি খুন, প্রতিটি নির্যাতন দেশের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। মানবতাবাদী মার্কিন ও পশ্চিমা রাষ্ট্রদূতরা কিন্তু এখন উপদেশ বা পরামর্শ দিচ্ছেন না। কেন দিচ্ছেন না, তার কারণ আগেই উল্লেখ করেছি।

বিএনপি-জামায়াতে যে এত ধর্ষক, এত খুনি, এত নির্যাতনকারী, এত প্রতিশোধকামী মানুষ আছে জানা ছিল না। দলটি তাহলে এদের দ্বারাই সৃষ্ট? এরা দেশটিকে পরিণত করছে ধর্ষক, খুনি ও লুটেরাদের দেশে। সারা বিশ্বে খালেদা-নিজামী সরকার বাংলাদেশের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুণ্ণ করছে। বাংলাদেশের পাসপোর্টধারীদের এখন দেখা হচ্ছে ও হবে খুনি, ধর্ষক ও লুটেরাদের দেশের নাগরিক হিসেবে। এ ভাবমূর্তি দেশে বিনিয়োগ বন্ধ করে দেবে। কমনওয়েলথ চিন্তা করছে জিম্বাবুয়েকে বহিষ্কার করবে; কারণ, নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর ভাষায়, জিম্বাবুয়েতে যা চলছে তা 'ফান্ডামেন্টাল ভ্যালুজ অফ কমনওয়েলথ'। বাংলাদেশও সে পথে চলছে। এ দেশটিও বিএনজেপির কল্যাণে কমনওয়েলথ থেকে বহিস্কৃত হবে কি-না কে জানে।

সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার যেটি ঘটছে, তাহলো সাধারণের মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা প্রবল হচ্ছে। মফস্বলের এক চায়ের দোকানে বসে আছি। শুনি একজন আরেকজনকে বলছে, 'শালারা ভাবছে কী, দিন আসুক, বাড়ি থাইক্কা তুইল্যা আনুম।' এটি যাদের লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে তারা হলো বিএনজেপির নেতাকর্মী, পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন। অন্যজন একথা শুনে বললো, 'সবাই কি শহরে থাহে? তাগো আত্মীয়স্বজনরে পামু না?' কী ভয়ঙ্কর আলোচনা! জোট তো আজীবন ক্ষমতায় থাকবে না। তখন এই প্রতিশোধস্পৃহা কি থামানো যাবে? এখন যে নীরব গৃহযুদ্ধ চলছে তা প্রবল হবে এবং আমরা অনেকেই তখন হত হবো, হত হবে বিএনজেপির নেতকর্মীরা তাদের পক্ষের অনেক মহিলাও তখন বলবে— বাবারা, একজন একজন করে আসো, আমার মেয়েটা ছোট। পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ তখন এই গৃহযুদ্ধ থামাবার জন্য কাউকে না কাউকে দায়িত্ব দেবে এবং তখনই গ্যাস, তেল, পাইপ লাইন— সব নিশ্চিত হবে। বিএনপির সমর্থকদের বলি, এ অবস্থা হতে দেবেন না, সবাই বিদেশ যেতে পারবেন না। আলতাফ চৌধুরীদের বোঝান। জানি না, বিএনপি সমর্থকরা কী করবেন। তবে লক্ষ্য করেছেন কি রাস্তাঘাটে, অফিস-আদালতে বিএনপির ইউনিফরম, সেই সাফারি স্যুট পরা মানুষজন খুব একটা দেখা যাচ্ছে না।

৪.৩.২০০২

ধর্ষিত হচ্ছে বাংলাদেশ

মুনতাসীর মামুন

আমার বন্ধুটি মৃদু বিএনপি। অর্থাৎ সমাজ, রাজনীতি নিয়ে সে খুব একটা চিন্তাভাবনা করে না। তার আগ্রহ অর্থনীতিতে; কারণ, সে ব্যবসা করে। তবে, ভোট দেয় সব সময় বিএনপিতে। আমি মনে করি সেটি স্বাভাবিক। কারণ, তার উত্থান প্রথম বিএনপির আমলে, ছোট খাটো ঋণখেলাপী হিসেবে। তবে, এটা ভাবাও ভুল, ঐ সময় যাদের উত্থান হয়েছে, সবাই ধানের শীষে ভোট দেয়। বন্ধুর মনটা একটু খারাপ। বললাম, 'কি হলো, ঝামেলা কিছু?' বলল, 'না, তেমন কিছু নয়। তবে, দু'টো ঘটনা ঘটেছে গত দু'দিনে। আমার ফ্যাক্টরিতে এসে বাচ্চা বিএনপিরা চাঁদা চেয়েছে, যেটা গত আমলেও ঘটেনি। দুই, খবরের কাগজ দেখে আমার বউ বলল, তোমাদের দলটি কি ধর্ষকদের দল হয়ে গেল? সেই থেকে সরকারি দলের নেতাকর্মী কাউকে দেখলেই মনে হয় এও কি জড়িত ঐসব ঘটনার সঙ্গে?'

বন্ধুর কথা শুনে আমিও বিষণ্ণবোধ করলাম। একটি রাজনৈতিক দলের পরিচয় যদি প্রতিমাসে বদল হয়, তাহলে তো মুশকিল। নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বলা হতো বিএনপিকে মুক্তিযোদ্ধার দল। নির্বাচনের পর বলা হতে লাগল জামায়াত পরিচালিত দল। যখন সরকার পরিকল্পিতভাবে পলিটিক্যাল ও এক ধরনের এথনিক ক্লিনসিং শুরু করল, তখন বলা হতে লাগল তালেবানদের দল। এখন মানুষজন বলছে ধর্ষকদের দল। বিএনপিকে কে পছন্দ করল না করল সেটি বড় কথা নয়, এটি বাংলাদেশের একটি বড় রাজনৈতিক দল। এর প্রবল এবং মৃদু সমর্থক অনেক এবং এর সবাই যে ধর্ষণ, লুট, সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত তা নয়। কিন্তু দায়টা নিতে হচ্ছে সমষ্টিগতভাবে। রাজনৈতিক দল সিভিল সমাজকে প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু, রাজনৈতিক দল যদি ব্যর্থ হয় বা মানুষের কাছে হেয় প্রমাণিত হয়, তখন সে আর সিভিল সমাজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। দেশে অরাজকতা হয়। অদ্ভুত সব শক্তি এসে ক্ষমতা দখল করে, মানুষকে দাস হিসেবে রাখতে চায়। বিএনপি-জামায়াত ক্যাডার যে খালি ধর্ষণের মহোৎসবে মেতে উঠেছে তা নয়। অধিকাংশ মৃদু এবং প্রবল সন্ত্রাস, খুনের সঙ্গেও জড়িত হয়ে পড়ছে। পরশুই তো কাগজে দেখলাম। ফরিদপুর জেলার সদরপুরের কৃষ্ণপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষককে পিটিয়েছে বিএনপিপন্থী ছাত্ররা। সে সব প্রসঙ্গ থাক, শুধু ধর্ষণের বৃত্তান্ত দিয়েই শেষ করি। এ ঘটনাগুলো ঘটেছে গত কয়েকদিনে। গত পাঁচ মাসের বিবরণ দিতে গেলে জনকণ্ঠের পুরোটা ছেপে দিতে হবে।

অভিজ্ঞতা এখন তারা একই কাজে লাগাচ্ছে। কিন্তু বিএনপির ক্যাডাররা কেন ধর্ষণ উৎসবে মেতে উঠছে— যেখানে জেনারেল জিয়া ১৯৭১ সালে ধর্ষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং বেগম জিয়া ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আটক ছিলেন? এর একটি কারণ, ধর্ষকদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে সরকার উৎসাহী নয় বরং প্রশ্রয়ে উৎসাহী। না হলে, আলতাফ চৌধুরী কীভাবে বলেন, 'আমাদের ছেলেরা আটকে থাকবে আর আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের হাতে মার খাবে— এটা কী করে হয়?' (ভো.কা.); মন্ত্রী পরে এ কথা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু, মূল কথা হলো, যে সন্ত্রাসীদের পরিপ্রেক্ষিতে এ খবরটি বেরিয়েছিল, তাদের আটক করা হয়েছে? হয়নি। আলতাফ চৌধুরী আরও বলেছেন, 'দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক।' (জনকণ্ঠ, ৪.৩.); বিবিসিকে তিনি বলেন, 'আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যতটা উন্নত হওয়ার কথা ছিল, ততদূর আমরা নিতে পারিনি, সে কথা সত্যি, তবে যে সময়ে আমরা আওয়ামী লীগের কাছ থেকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পেয়েছিলাম, সে তুলনায় অনেক উন্নতি হয়েছে এবং আমরা রিজনেবলি স্যাটিসফাইড।' গত পাঁচ মাসে আলতাফ চৌধুরীর কোনো মন্তব্য মানুষ সিরিয়াসলি নেয় নি। কারণ, সিরিয়াস বিষয় কোনটা এ সম্পর্কে ধারণা তাঁর নিতান্ত অল্প। এ কারণে, ডেইলি স্টারে তাঁকে নিয়ে যে কার্টুন বেরিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, তিনি বলছেন, পরিস্থিতি ভালো; অন্যদিকে খুনের সংখ্যা বাড়ছে। যাকে সবাই সিরিয়াসলি নেয় সেই সাইফুর রহমান বলছেন, "এই মুহূর্তে অর্থনীতিতে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি।" (ইত্তেফাক, ৭.৩.২০০২) সরকার কীভাবে চলছে তাহলে বুঝতেই পারছেন! এমনকি সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা পর্যন্ত বলছে, 'সরকারি দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে আইনশৃঙ্খলার অবনতি।' (জনকণ্ঠ, ৬.৩)।

মানুষ বিএনপিকে এই নতুন নামে কেন ডাকছে? ধর্ষণ সব দেশেই হয়। এ দেশেও হয়েছে। কিন্তু, এখন দেখা যাচ্ছে, এই ধর্ষণের মধ্যে একটা প্যাটার্ন আছে। সেটি হলো ধর্ষণ ব্যবহৃত হচ্ছে শুধু দৈহিক চাহিদা মিটাবার জন্যই নয়, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্যও। অনেক ক্ষেত্রে কাজ করছে ধর্মীয় প্রতিহিংসারও। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে পূর্ণিমা। তার পরিবার ধানের শীষে ভোট দিয়েছিল। তাহলে সে গণধর্ষিত হলো কেন? কারণ, সে হিন্দু। এতে তালেবানী সংস্কৃতির প্রভাব আছে। তালেবানদের প্রতি সহানুভূতিশীল জামায়াত, আমিনীদের দল জোটের অংশীদার। সাঈদীর ক্যাসেট শুনলেই বুঝবেন, মহিলাদের এরা কী চোখে দেখে। স্বাভাবিকভাবে, বিএনপি তাদের দ্বারা প্রভাবিত।

১. দোহারে ইসমত আরা বিএনপি ক্যাডার দ্বারা গণধর্ষিত।
২. মনপুরায় মা-বাবার সামনে গণধর্ষণ করেছে ক্যাডাররা তাদের ষোড়শী কন্যাকে। (ভোরের কাগজ, ৫.৩.০২)।
৩. কুখ্যাত সন্ত্রাসী বিএনপি ক্যাডার নিগ্রো মাসুদের নেতৃত্বে ৪ সন্ত্রাসী এক বাড়িতে গিয়ে মা-মেয়েকে ধর্ষণ ও অপহরণ করার চেষ্টা করলে জনতার হাতে ধরা পড়ে। (ঐ)

৪. শিবগঞ্জ থানা বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক মীর শাহ আলমের বিরুদ্ধে বন্ধুর স্ত্রী ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ। (প্র. আলো. ৭.৩.০২)।
৫. ঝালকাঠীতে ছাত্রদল নেতা মুরাদগাজি কলেজ ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। (জনকণ্ঠ, ৬.৩.০২)।
৬. পুঠিয়ায় মহিমা ধর্ষণের রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই ক্যাডাররা চল্লিশ বছরের এক গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা করে।
৭. সাবিনা ধর্ষিত হয়েছে উত্তরাঞ্চল জনপদে ক্যাডারদের দ্বারা। তার পর তারা তার লাশ ঝুলিয়ে রাখে বাড়ির সামনে গাছের ডালে। সাবিনার মা অভুক্ত থাকছেন। বলেছেন, 'সালিশে চেয়ারম্যান আমাকেসহ আমার মেয়েকে নষ্ট বলে বদনাম দিয়েছে। আমার মেয়ে রাতে ভাত না খেয়ে খুন হয়েছে। সেই ভাত আমি কী করে খাই?' (প্র. আলো. ৭.৩.)।
৮. সিরাজগঞ্জে ১১ বছরের মুক্তাকে বিএনপির ক্যাডাররা ধর্ষণ করেছে।' (জনকণ্ঠ, ৫.৩.০২)।

ধর্ষণের সব খবর কি আমরা পাই, না তা পত্রিকায় আসে? খুব কম ক্ষেত্রেই পুলিশকে এসব ঘটনা জানানো হয়। সামাজিক ভয়, লজ্জা তো আছেই। যা আমরা জানি, তার চেয়ে বেশি ধর্ষণ হয়, হচ্ছে। কিন্তু, যতটুকু আমরা জানি, তার পরিসংখ্যান নিলেও শিউরে উঠতে হবে। পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, 'দেশে প্রতিদিন ৩৭ জন নারী ও শিশু নির্যাতিত হচ্ছে।' বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থার জরিপ অনুযায়ী গত মাসে ৫৬ জন নারী ও শিশু ধর্ষিত হয়। ধর্ষণের পর ৮ জনকে হত্যা করা হয়েছে। গণধর্ষণের শিকার হয়েছে ২৫ জন। ধর্ষিতদের মধ্যে ২৯ জনই নাবালিকা। এদের মধ্যে ৪ বছরের শিশুও রয়েছে।' (জনকণ্ঠ, ৮.৩)।

আরও একটি জরিপ অনুযায়ী লতিফ-সাঈদ-মুয়ীদের সময় থেকে অর্থাৎ ১ অক্টোবর থেকে এ বছরের ৬ মার্চ পর্যন্ত এ্যাসিডের শিকার হয়েছে ১৭৪ নারী, নির্যাতনে আহত হয়েছে ৪২০ জন। নারী নির্যাতনের ঘটনা ৭ হাজার ছাড়িয়ে গেছে এবং ৯৫ ভাগ আসামীর কোনো শাস্তি হয়নি। নারী নির্যাতন আইনে দায়ের করা সব আসামীই খালাস পেয়ে গেছে।

এটি কি কোনো-বিদেশীদের ভাষায়, 'মডারেট ইসলামী দেশ'-এর চিত্র? সাম্প্রতিককালে আফগানিস্তান ছাড়া আর কোনো দেশে এমন নারী নির্যাতন হয়নি। বাংলাদেশে তালেবানরা যা চাচ্ছিল তাই করা সম্ভব হয়েছে জোট সরকারের তালেবানদের প্রতি সহানুভূতিশীল দল থাকায় এবং ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে পশ্চিমা দেশগুলো বিদেশে তালেবানদের বিরুদ্ধে লড়লেও বাংলাদেশে তারা তালেবানদের পক্ষে। স্বার্থ এমনই জিনিস— যেখানে মানবাধিকার আর বড় কোনো বিষয় হয়ে ওঠে না।

১৯৭১ সালে জামায়াত কর্মীরা হানাদার বাহিনীর সঙ্গে ধর্ষণে লিপ্ত ছিল। কারণ, তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিহিংসা কাজ করছিল। তাদের সেই ধর্ষণ যে শুধু বিএনপি-জামায়াত কর্মীরাই করছে তা নয়। এতে অনুপ্রাণিত হচ্ছে

পেটি সন্ত্রাসীরাও। তারা এটাকে বীরত্বের নতুন সংস্কৃতি মনে করছে। তা ছাড়া তারা তো খবরের কাগজে দেখেছে, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে ঘিরে আছে সন্ত্রাসীরা। আলতাফ চৌধুরী বিএনপি-জামায়াত সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসী মনে করেন না। শুধু তাই নয়, অনেক মন্ত্রী মনে করেন এরা ত্যাগী কর্মী। অর্থাৎ সন্ত্রাস করে তারা নির্বাচনে সহায়তা করেছে জোটকে। এই ধর্ষণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। এক, বয়স এখানে বিবেচ্য নয়, ৪ থেকে ৪০-মহিলা হলেই হলো। দুই, গণধর্ষণের সংখ্যা বাড়ছে। তিন, বিএনপি-জামায়াত ক্যাডারদের লক্ষ্য শুধু আওয়ামী লীগ সমর্থক ও হিন্দুরা। চার, অনেকে আত্মহত্যা করছে। কয়েকদিন আগে মিরপুরের ফাহিমা এর সর্বশেষ উদাহরণ। কুষ্টিয়াতেও এক জামায়াত ক্যাডার এক কিশোরীকে ধর্ষণ করে। সে বিচার না পেয়ে কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সামনে আত্মাহুতি দিতে আসে। শুধু বিএনপি নয়, এভাবে চলতে থাকলে বাংলাদেশও পরিচিত হয়ে উঠবে ধর্ষকদের দেশ হিসেবে।

যে বিষয়টি অনেকেই এড়িয়ে যাচ্ছে বা আলোচনায় আনছেন না তাহলো, এই যে বাংলাদেশ ধর্ষিত হচ্ছে হররোজ। এতে কি সমাজের প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ করার কিছু আছে? লক্ষণীয় যে, এসব কর্মকাণ্ডের জন্য সমাজের যেভাবে উচ্চকিত হওয়ার কথা ছিল, তা হচ্ছে না। এর একটি কারণ হতে পারে, গ্রামাঞ্চল এখন সম্পূর্ণ অরক্ষিত এবং তা ঘেরাও হয়ে আছে বিএনপি-জামায়াত ক্যাডার ও আলতাফ বা কোহিনুর বাহিনী দ্বারা। তাদের মনে ক্রোধ থাকলেও তা পুঞ্জিভূত হচ্ছে। অনেকে মনে করছেন তারা নিরাপদ— যেমন ১৯৭১ সালে অনেকে মনে করেছিল। শহরাঞ্চলে একমাত্র খবরের কাগজগুলো রুখে দাঁড়াচ্ছে। জোটসমর্থক মহিলা-পুরুষদের হয়ত মনে হচ্ছে, দেশ মানে তো শহর, গ্রাম নয়। আমাদের কিছুই স্পর্শ করবে না। সমাজ যদি বোবা হয়ে যায়, এসব কর্মকাণ্ড অবলোকন করে, তাহলে সে সমাজ আর সুস্থ সমাজ থাকে না। এখন মনে হচ্ছে, ধর্ষিত হচ্ছে বাংলাদেশ; কিন্তু ক্রন্দনের কেউ নেই। ১৯৭১ সালে সন্ধ্যা হলে রাস্তাঘাট খালি হয়ে যেত, অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা ঘিরে থাকত চারদিক। মানুষরা জেগে থাকত, এই বুঝি ঝাঁকে ঝাঁকে হানাদার এল, যেমন তৃণভোজীরা কাঁপতে থাকে হায়নার অট্টহাসি শুনে। এখন, গ্রামবাংলায় সন্ধ্যার পর চারদিক নিস্তব্ধ, হাটবাজার-রাস্তাঘাট নিঝুম, অন্ধকারে বাবা-মা জেগে থাকে— এই বুঝি ক্যাডাররা এল। এসে বলবে টাকা দাও। টাকা না থাকলে বউ দাও, মেয়ে দাও। না হলে দায়ের কোপ খাও। এভাবে তারা বাবা-মায়ের সামনে ধর্ষণ করে মেয়েকে, ক্লাস নাইনে পড়া ছেলের সামনে মাকে। এক মা মিনতি করে বলে, 'বাবারা, আমার মেয়েটা ছোট, একজন একজন করে আসো।' অপেক্ষা করুন, শহরের হে ভদ্রজনরা আপনাদের বাড়িতেও আসবে হানাদাররা আপনারাও বিনিদ্র রজনী কাটাবেন, যেমন কাটিয়েছিলেন ১৯৭১ সালে। যে দলই করুন বা সমর্থক বা 'নিরপেক্ষ' হন— প্রতিবাদ না করলে কারো বাঁচোয়া নেই, কারণ, রাষ্ট্র একে প্রশ্রয় দিচ্ছে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও ধর্মীয় প্রতিহিংসা চরিতার্থে।

১২.৩.২০০২

নারী নির্যাতনের ঘটনাও রাজনীতিকরণ করা হয়েছে

মুনতাসীর মামুন

নারী নির্যাতন এখন কোনো ব্যক্তিক ঘটনা নয়, নারী নির্যাতন হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক কৌশল। ব্যাপক অর্থে নারী নির্যাতনের অন্তর্গত ধর্ষণ, অ্যাসিড নিক্ষেপ থেকে মানসিক পীড়ন পর্যন্ত এবং এই অর্থে তা আমাদের সংস্কৃতিক অঙ্গ। ধর্মান্ধতা, ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা, অশিক্ষা, পুরুষতান্ত্রিকতা– এসব মিলে সৃষ্টি করেছে এই সংস্কৃতির, যার মূল অর্থ নারীর অবস্থান সমাজে অধস্তন। স্বাধীনতার পর থেকে এই অধস্তনতা পেরিয়ে আসতে সচেষ্ট হয়েছেন নারী; কিন্তু সমাজের মৌল পরিবর্তন না হওয়ায় গ্রামেগঞ্জে নারী অধস্তনই থেকে যাচ্ছেন।

নারী নির্যাতন এতদিন ছিল ব্যক্তিক। দুই দুইজন নারী প্রধানমন্ত্রী এক দশক দেশ শাসন করার পরও অবস্থার পরিবর্তন আনতে পারে নি। রাজনীতিতে তারা পুরুষতান্ত্রিক বাধা-নিষেধ উৎপাটন করেছেন; কিন্তু সামাজিকভাবে পরিবর্তন আনতে পারে নি। তাই নারী নির্যাতনের ঘটনা কমেনি; বরং বেড়েছে। দুঃখজনক হলো, নতুন শতকের শুরুতে একজন নারী প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর নারী নির্যাতন হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক হাতিয়ার।

বর্তমানে নারী নির্যাতনের রাজনীতিকরণ করা হয়েছে। এর দু'টি দিক আছে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ এবং শুধু তা-ই নয়, একই সঙ্গে রাজনৈতিক অধস্তনতা সৃষ্টি করা। প্রতিহিংসার মধ্যে অন্তর্গত ধর্ষণ ও গণধর্ষণ এবং ধর্ষিতার বিবস্ত্র ছবি তোলা, ভিডিও করা ও তার প্রদর্শন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলোর সঙ্গে জড়িত বিএনপি ও জামায়াত বা জোট ক্যাডাররা। যে নারীকে ধর্ষণ, গণধর্ষণ বা অ্যাসিড মারা হচ্ছে; তিনি বিপক্ষ দলীয় রাজনৈতিক কর্মী হতে পারেন, সমর্থক হতে পারেন। অথবা তার পরিবার যুক্ত বিপক্ষ রাজনীতির সঙ্গে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ, এর অর্থ ভীতি সৃষ্টি করা সম্প্রদায়ের মাঝে। অর্থাৎ বিপক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে পরিবারের এ অবস্থা হতে পারে। আগেও নারী ধর্ষণ, অ্যাসিড নিক্ষেপ হয়েছে, তবে তা ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঘটনা। এখন প্রায় ক্ষেত্রে তা আর ব্যক্তিগত ঘটনা থাকছে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ অনুসারে শুধু গত সাত মাসে নারী নির্যাতনের ঘটনা দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ৫৮১টি। ছবি রানীর ঘটনা এ-ধরনের নারী নির্যাতনের সর্বশেষ উদাহরণ।

এসব ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরো দুটি বিষয় লক্ষণীয়। মানুষ নির্যাতিত হলে আশ্রয় ভিক্ষা করে পুলিশের। কারণ মানুষকে রক্ষার দায়িত্ব তার। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, পুলিশ এসব ঘটনা আমলে নিচ্ছে না প্রায় ক্ষেত্রে। অর্থাৎ পুলিশও রাজনৈতিক ক্যাডারের ভূমিকা পালন করছে। আরো দুঃখজনক এই যে, মানুষের

সেবক ডাক্তাররা অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যা রিপোর্ট দিচ্ছেন হয় রাজনৈতিক চাপে বা তারা নিজেরাও ক্যাডার হিসেবে পরিচিত হতে চাচ্ছেন। আদালতে মামলা হলে তা চলে দীর্ঘদিন। প্রায় ক্ষেত্রে আসামি আবার ছাড়া পেয়ে একই কাণ্ড করে। এখানে উল্লেখ্য, যে হিসাব দেয়া হয়েছে তা থানায় রেজিস্ট্রিভুক্ত। কিন্তু আমরা জানি, অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা থানা পর্যন্ত পৌঁছায় না।

সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে জুলাই ২০০২ পর্যন্ত নারী নির্যাতনের একটি ছক তৈরি করেছে মহিলা পরিষদ (ছক দেখুন)। মাত্র ১০টি পত্রিকার ভিত্তিতে করা এই সারণিতে দেখা যায়, নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ৪ হাজার ২৯৫। বাংলাদেশে প্রকাশিত সব পত্রিকার ওপর ভিত্তি করে সারণি তৈরি করলে এ সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। তাহলে একবার ভাবুন দেশের অবস্থা কী!

পুলিশ প্রায় ক্ষেত্রে শুধু নারী নির্যাতনের নীরব সমর্থক নয়, তারা নারী নির্যাতনের আইনি একটা আবহও সৃষ্টি করছে। আজকাল দেখা যাচ্ছে, অভিযুক্ত বা সন্দেহভাজন কাউকে গ্রেপ্তার করতে না পারলে পুলিশ সেই অভিযুক্ত বা সন্দেহভাজনের মা, স্ত্রী বা বোনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসছে। আমি জানি না, কোনো আইনে এটা সম্ভব কি-না। নারীর অবস্থা যেহেতু ভঙ্গুর, সেজন্য এই পন্থা ব্যবহার করা হচ্ছে। যদি আইনি না হয়, তাহলে সরকার এ অবস্থা চলতে দিচ্ছে কেন? এটিও এক ধরনের নারী নির্যাতন।

নারী নির্যাতনের আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, সেটি হলো শিশু নির্যাতন। মাত্র এক মাসে দেখা যাচ্ছে, ১০ বছর পর্যন্ত মেয়ে নির্যাতিত হয়েছে ৬০ জন আর ১০ থেকে ১৫ পর্যন্ত মেয়েশিশু নির্যাতনের সংখ্যা ১২৭ জন, যা মোট নির্যাতিতের ৩৩ ভাগ। আর শুধু জুলাই মাসে নির্যাতিতের সংখ্যা ৫৮৬ জন।

জুলাই	২০০২	
বয়স (বছর)	সংখ্যা	শতকরা হার
১০ বছর পর্যন্ত	৬০	১১
১১-১৫	১২৭	২২
১৬-২০	১০৮	১৯
২১-২৫	১০৩	১৮
২৬-৩০	৬২	১১
৩১-৩৫	৩১	৬
৩৬-৪০	১১	১
৪০+	৩৫	৫
বয়স উল্লেখ নেই	৪৯	৭
মোট	৫৮৬	১০০

যে বিষয়টি আমাদের অনেকের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে তাহলো, নির্যাতনকারীদের একটা বড় অংশের বয়স ১৮-এর নিচে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিশু অপহরণ বা নির্যাতনের বিষয়। অবশ্য এর সব রাজনৈতিক, তা নয়।

এখানেও উল্লেখ্য, অপহরণকারীদেরও একটা বড় অংশ খুবই তরুণ। মহিলা পরিষদের তথ্য অনুযায়ী, শতকরা ২০ ভাগ ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে হিন্দুদের সম্পত্তি দখলের জন্য, যা রাজনৈতিক। কারণ জোটের একটা লক্ষ্যই হচ্ছে হিন্দুশূন্য বাংলাদেশ। শতকরা ১০ ভাগ জৈবিক নিবৃত্তির জন্য। মাত্র ১০ মাসে পুরো বিষয়টি উল্টে গেছে। এ ধরনের ঘটনা বাংলাদেশের সবখানেই ঘটছে, তবে বেশি ঘটছে সীমান্তবর্তী এলাকা ভোলা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, রাউজান, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নওগাঁ, বরগুনা, পটুয়াখালী, রাজশাহী, নেত্রকোনা, কুমিল্লা, খুলনা, যশোর, সিলেট, চাঁদপুর, ফরিদপুর, ঝালকাঠি, বরিশাল, টাঙ্গাইল এবং চরাঞ্চলে। এসব অঞ্চলে সংসদ সদস্যরা সব জোটের।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন এখন ঘটনা ভয়াবহতার পর্যায়ে গেছে। এর কারণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। এর শুরু 'সালসা' নির্বাচনে। লতিফুর, সাঈদ ও মুয়ীদ— এই ত্রিমূর্তি নিপীড়নের শুরু তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে। তাদের নির্দেশে এতে যোগ দেয় পুলিশ ও সেনাবাহিনী। জোটের নেতাকর্মীরা গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে যায় নিপীড়নের এবং তারা ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থের জন্য নারী নির্যাতন বেছে নেয়। এদিকে আরো জোরদার করে আরেকটি বিষয়। ১০ হাজার অপরাধীকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়। এই মেসেজটিই পৌঁছে দেয়া হয়, শুরু করে ধর্ষণের মহোৎসব। উৎসব শুরু হতে দেখা যায়, পুলিশও এর নীরব বা সরব সমর্থক। যে কারণে ঘটে শামসুন নাহার হলের মতো কদর্য ঘটনাও। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, বিষয়টি এখন এমন পর্যায় গেছে যে, জোটের 'ভদ্রলোক'রাও মুষড়ে পড়ছেন। এসব বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন নির্দেশ, উপদেশও কেউ শুনছে না। পুরো পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এতদিন সংবাদপত্রগুলো এক ধরনের প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছিল। কিন্তু মুশকিল হলো, আদর্শিক এবং ব্যবসায়িক কারণে অধিকাংশ পত্রিকা জোটের সমর্থক। জোটের দিকে তাকিয়ে তারা এখন এসব খবর এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

কয়েকদিন আগে মহিলা পরিষদ আমাদের কয়েকজনকে ডেকেছিল বিষয়টির ভয়াবহতা তুলে ধরার জন্য এবং এর প্রতিকার কী হতে পারে, তা আলোচনার জন্য। বিষয়টি রাজনৈতিক এবং তা রাজনৈতিকভাবেই মোকাবেলা করতে হবে। এই রাজনীতির অর্থ, যে আমলে বা যে সরকারের সময় এসব ঘটনা ঘটবে, তার প্রতিকার না হলে সে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। এখানে নিরপেক্ষতার ভণ্ডামির কোনো স্থান নেই। আর সামাজিকভাবে বিভিন্ন সমমনা গ্রুপের (পেশাজীবী থেকে এনজিও) কোয়ালিশন গড়ে তুলতে হবে সামাজিকভাবে তা প্রতিরোধের জন্য। নির্যাতিতদের সাহস জোগাতে হবে। আশার কথা, নির্যাতিত নারীরাই এখন এসব নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদ জানানোর জন্য এগিয়ে আসছেন। তবে নির্যাতনকারীদের যে সংবাদটি পৌঁছে দেয়া দরকার তাহলো, আজ আমার স্ত্রী-মেয়ে বা বোন ধর্ষিত হচ্ছে। কাল তোমার স্ত্রী-মেয়ে বা বোন ধর্ষিত হবে। এ সংবাদ তাদের কানে না পৌঁছলে অবস্থার পরিবর্তন হবে না কস্মিনকালেও।

এখনই যদি রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে নারী নির্যাতন বন্ধ না হয়, তাহলে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে তা আমরা অনেকেই কল্পনা করতে পারছি না। প্রতিহিংসা প্রতিহিংসার জন্ম দেয়, নিবৃত্ত করে না।

শেষ করি একটি ঘটনার উল্লেখ করে। কয়েকদিন আগে আমাদের বিদেশী এক সাংবাদিক বন্ধু ফোন করে বললেন, 'হচ্ছেটা কী তোমাদের ওখানে? আমার বন্ধুরা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, বাঙালি এখন ধর্ষণ করে, ছবি তোলে আবার তা দেখায়। জাতি হিসেবে এরা এখন কোথায় যাচ্ছে?

এর উত্তর দেয়া সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে।

১০টি দৈনিক পত্রিকার পেপার ক্লিপিঙের ভিত্তিতে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঃ সেপ্টেম্বর ২০০১—জুলাই ২০০২

নির্যাতনের প্রকৃতি	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	মোট
	'০১	'০১	'০১	'০১	'০২	'০২	'০২	'০২	'০২	'০২	'০২	
ধর্ষণ	২০	৮৫	৪৮	৩৩	৫০	৩৬	১০৫	১৪০	১২৭	১৩৮	১০৫	৮৮৫
গণধর্ষণ	৬	১৫	৮	১৪	২৮	১০	৪২	৩৯	৪৮	৩৩	৪৮	২৯৯
ধর্ষণের পর খুন	৩	৫	৭	৪	৯	৯	১০	১৪	৯	২২	১১	১০৩
অ্যাসিড নিক্ষেপ	১২	১৫	৯	১৬	২৮	১৫	১৬	২০	৩০	৪৪	৩৭	২৫৭
অগ্নিদগ্ধ	২	২	১	২	৪	৪	৬	০	৪	৫	৩	৩৩
ফতোয়া	১	৩	৪	১	১	৪	৫	০	১	৬	৬	২৯
অপহরণ	৭	১৭	১৯	১৬	৪৮	২৩	৩২	৩৯	৪৩	৫৫	৩৫	৩৩৪
কাজের মেয়ে নির্যাতন	১	১	২	২	২	২	২	২	০	২	৪	২০
বিদেশে পাচার	১	০	০	০	০	০	০	০	০	-	-	১
খুন	৩২	৪৩	২৯	৩৮	৫১	৪৭	৯০	৮৩	৮৩	৯৮	১১০	৭০৪
পুলিশি নির্যাতন	০	০	০	০	০	২	০	০	০	-	২	৪
পতিতালয়ে বিক্রি	৩	১	৩	১	১	১	৩	৩	০	৩	৫	২১
নারী ও শিশু পাচার	৫	০	৪	১	০	৮	৩৩	২	৩৪	৭	২৭	১১৮
শিশুদের পতিতা বৃত্তি	০	৩	১	০	১	০	২	০	০	৪	১	১২
যৌতুকের কারণে নির্যাতন	৬	৪	৭	৮	৯	২	৪	১২	৯	১৬	১২	৯৯
যৌতুকের কারণে খুন	১১	৫	৪	৫	৬	৬	১৯	২৮	১৯	২৩	১৫	১৩৯
শ্লীলতাহানি	৪	১০	১১	৬	২৫	৯	১৫	১৭	২৭	১৩	২৮	১৬৫
রহস্যজনক মৃত্যু	৬	১৫	৯	৬	২২	১০	১১	১৪	১৩	২১	১৮	১৪৭
শারীরিক নির্যাতন	৫	৫	১৮	৩১	২৬	৩৩	২৯	২৪	২৭	৩৩	২৪	২৫১
আত্মহত্যা	২৮	১৯	২৯	২২	৩৫	৩৫	৫৯	৫৯	৩৯	৮০	৬০	৪৬০
অন্যান্য	৫	৭	১০	১৩	১৫	১৪	১৩	২০	২২	৩৬	২০	১৭৫
সর্বমোট	১৬৩	২৫১	২২১	২১৯	৩৫৯	২৬৭	৪৯০	৫৪১	৫৩৩	৬৩৮	৫৮৬	৪২৬৫

সূত্র ঃ নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও আইন সহায়তা উপ-পরিষদ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

২.৯.০২